উত্তর দক্ষিণ

১৪২৩ / ২০১৬

সংখ্যা - ৮৯

কৃষি - ৩

: এ সংখ্যায় :

গদ্য : সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভ্রকেতন বসু, প্রবীর মন্ডল, রূপক কুমার পাল, মনোজ দাস, সুদেব সাহা, অনুপম পাল, চিন্ময় দাস, অভিজিৎ সরকার ও জাতীশ্বর ভারতী

সংবাদ পরিবেশ: চিন্ময় দাস, বিশ্বজিৎ বসাক

ছবি: শুভম ভট্টাচার্য, শুভ্রদীপ চৌধুরী

মুখোমুখি : কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায় (মধুদাদু)

সম্পাদক : শুভম ভট্টাচার্য

সংখ্যা সম্পাদনা : সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : সূরজ দাশ

ভাষাকর্মী: সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, সোহেল ইসলাম, শুভ্রদীপ চৌধুরী, রূপক কুমার পাল, ফয়জুল রহমান, দেবসত্য কুমার, মনোজ অধিকারী, টিপু মন্ডল, সোমনাথ দত্ত ও সুমন চক্রবর্তী

সংগ্রহ : ৪০ টাকা

শুরুর কথা

কথিত আছে সমুদ্র মন্থনের ফলে উঠে আসা বিষ পান করে মহাদেব হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। পুরাণের এই অতিকথন, একবিংশে এসে রূঢ় বাস্তব। তৃতীয় বিশ্বের ঘরে ঘরে এখন শিব... সবাই আকণ্ঠ বিষে ডুবে আছি। সৌজন্যে আন্তর্জাতিক মাফিয়া সার ও বিষ কোম্পানী। তবে দেবতার মতো মানুষের অমরত্ব নেই... সুতরাং... । 'উদ্বৃত্ত উৎপাদন' নামক রাক্ষসটি প্রতিদিন একটু একটু করে গিলছে আমাদের ... বাড়িঘর, জল, জমি, জঙ্গল, গাছপালা, বীজ, পরম্পরাগত কৃষিজ্ঞান, বাস্তুতন্ত্রের অধীন খাদ্যশৃঙ্খল, বন্ধু কীটপতঙ্গ, উৎপাদন-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস...আরও বেশি, আরও আরও বেশি চাই ... কেননা কৃষিকে 'লাভজনক', 'অতিলাভজনক' করে তুলতে প্রতিযোগিতা চলছেই। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন— 'কৃষকদের উপার্জন দ্বিগুন করে তুলতে হবে...'। কিন্তু প্রশ্নটা হলো কীভাবে?

ইতিমধ্যে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে কৃষিতে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিয়েছে 'আম-আদমিকা সরকার'। এতে নাকি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রচুর কর্মী নিয়োগ হবে। আর এই খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মিত হলেই নাকি কেল্লা ফতে! উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য নাকি আর সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে না... কোনও মহামারী হবে না... দুর্ভিক্ষ হবে না ... চারদিকে ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি ওম্ ... ওদিকে বহুজাতিক মাফিয়া পুঁজি (জার্মানীর বেয়ার কিনে নিচ্ছে আমেরিকার মনসান্টোকে) একজোট হয়েছে। ভারতের কৃষিবাজার দখল করতে সম্পূর্ণভাবে মরিয়া এই দুই সার ও বীজ কোম্পানীর একত্র হওয়া চূড়ান্ত 'একচেটিয়া আগ্রাসনের' ইঙ্গিত। এদের দারস্থ হওয়া ছাড়া কৃষকের যাতে কোনও বিকল্প না থাকে তারই 'সু-ব্যবস্থা'! আর এরই ফাঁকে **FDI**এর ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জি.এম. সরিষা উৎপাদনের ছাড়পত্র দিল সরকার। যেখানে গোটা ইউরোপ জিন পরিবর্তিত খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ করছে, সেখানে জি.এম. ফসলের নতুন উপনিবেশ 'ইন্ডিয়া'! দুইয়ে-দুইয়ে চার বুঝতে কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে?

এ দেশের জনসংখ্যার ৫৪.৬ শতাংশ মানুষ কৃষিতে নিযুক্ত। **FDI** হলে কৃষিতে আরও বেশি কর্মীনিয়োগ হবে, এ ছেঁদো যুক্তি ধোপে টেকে না। আবার শস্য সংরক্ষণের অভাবে অর্ধেক ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাই **FDI**, এ যুক্তিও আপত্তিকর। আমাদের প্রশ্ন— কোন কৃষিপণ্য, যার আদ্যপ্রান্ত বিষে ভরা, যার প্রতিটি কণা অনুখাদ্যহীন, যার প্রতিটি ছোবল দেশবাসীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে, তার সংরক্ষণ?

অথচ এই অতিরিক্ত পরিকাঠামো, সংরক্ষণাগার ইত্যাদির ফাঁদে না পড়ে এ দেশের দরকার ছিল সার্বভৌম কৃষি ব্যবস্থা আর তা গড়ে উঠলে প্রতি কৃষকের ঘরে ঘরে থাকত শস্যগোলা ... দরকার ছিল আমাদের পরম্পরাগত কৃষিব্যবস্থাকে বাঁচাতে নতুন সাংবিধানিক আইন ...দরকার ছিল লাতিন আমেরিকার কিউবা, ভেনেজুয়েলার মতো জৈবচাষ বাধ্যতামূলক করা। যদিও আমাদের দেশেরই সিকিম ইতিমধ্যে জৈব-রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু গোটা দেশে সুস্থায়ী উন্নয়নের স্বার্থে একই পদক্ষেপ কেন অনুসৃত হবে না? গত আর্থিক বছরে (২০১৬-১৭) জৈব চাষের জন্য বাজেটে বরাদ্দ মাত্র ৪১২ কোটি আর ভারতীয় উপমহাদেশে যে ছায়াযুদ্ধ 'আন্তর্জাতিক পুঁজি'র স্বার্থে সংঘটিত হবে না বললেই চলে, তার জন্য সামরিক খাতে বরাদ্দ ২.৫৮ লক্ষ কোটি টাকা! এই সহজ অঙ্ক বুঝতে পারলেই তুমি দেশদ্রোহী ... ছর্‌রা, বন্দুক, হ্যান্ড গ্রেনেড, এ.কে. ৪৭ ছুটে আসবে তোমার দিকে। বিরুদ্ধ মতকে খতম করতে কতই আর গুলি লাগে...এক রাউন্ড ...দশ রাউন্ড ...কিম্বা ...

জিম্বাওয়ের জৈবচাষ... আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং খাদ্যসুরক্ষা

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

'জিম্বাওয়ে' শব্দটা কানে বাজলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ১৯৮৩... বিশ্বকাপ ক্রিকেট.... টেন্টব্রীজ স্টেডিয়াম... টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারতের শোচনীয় পরিস্থিতি... ১৭ রান, ৫ ব্যাটসম্যান... পরাজয় নিশ্চিত.... বিশ্বকাপ থেকে বিদায় সময়ের অপেক্ষা... তারপর ইতিহাস... ১৩৮ বলে ক্যাপ্টেন কপিলদেবের অপরাজিত ১৭৫...। আশ্চর্যের বিষয় ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ জিতলেও জিম্বাওয়ে মানেই আমাদের কাছে ১৯৮৩, জিম্বাওয়ে মানে কপিলদেবের ১৭৫, ভারতীয় হিসেবে আরও একটা উল্লাসের দিন, জিম্বাওয়ে মানেই অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার-গ্রান্ট ফ্লাওয়ার, জিম্বাওয়ে মানেই কোনও কোনও দিন চমক দেওয়া হিথ স্ট্রিকের বোলিং, জিম্বাওয়ে মানেই ক্যাপ্টেন ক্যাম্বেলের উইকেট আঁকড়ে শেষ চেষ্টা, জিম্বাওয়ে মানেই বলে বলে হারানো...। আর এই জিততে জিততে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম জিম্বাওয়ের মত একটা দেশের কাছে আমরা হেরে যেতে পারি।

না, ক্রিকেট নয়। জিম্বাওয়ে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে জৈব কৃষিতে। ২০০০ সালের পর থেকে সারা দেশটা বদলে গেছে জৈবকৃষিতে। তবে এর পেছনে রয়েছে সেই একই কিউবার মত বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা.... অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার গল্প। যেভাবে কিউবার ৪৭ শতাংশ জমির মধ্যে মাত্র ১.৫ শতাংশ জমির মালিকানাসত্ত্ব ছিল কিউবার মানুষের, যেভাবে কিউবার ৩০ শতাংশ জমির নিয়ন্ত্রণ ছিল ৫ মার্কিন চিনি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে, যেভাবে কিউবার ৭৫ শতাংশ জমির দখল নিয়েছিল মার্কিন নাগরিক এবং সে দেশের কর্পোরেট... ঠিক সেরকমই জিম্বাওয়ের চাষযোগ্য জমির ৭০ শতাংশই ছিল ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত হোয়াইট ফার্মারদের দখলে। যারা শতাংশের দিক থেকে জিম্বাওয়ের জনসংখ্যার ৭ শতাংশ। এখানে আরো কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা দরকার, জিম্বাওয়ের অর্থনীতির ৭৫ শতাংশ মূলত কৃষি নির্ভর এবং শিল্পগুলোর ৩/৪ অংশ কৃষিজাত দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া ২০০০ সালের আগে পর্যন্ত দেশটার কৃষি বলতে হোয়াইট ফার্মারদের ফার্মভিত্তিক বাণিজ্যিক কৃষিকেই বোঝাত। ৮টি প্রদেশ মিলে হোয়াইট ফার্মারদের নথীভূক্ত সেই ফার্মের সংখ্যাটা ছিল ৮৭৫৮ অর্থাৎ ১৪.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর জমি। যার মালিক ছিলেন সে দেশের মাত্র ৪০০০ হোয়াইট ফার্মার। গড়ে যাদের প্রায় প্রত্যেকেরই দুই বা দুইয়ের অধিক খামার ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এক একজন হোয়াইট ফার্মারের ১০টি খামারও ছিল। যে খামারগুলোর এক একটার আয়তনই ৩০০০ হেক্টর করে। হোয়াইট ফার্মারদের সবচেয়ে বেশি খামার ছিল মাসোনাল্যান্ড পশ্চিমে ২২২৮টি, মানিক্যান্ডে ১২৯৯টি, মাসোনাল্যান্ড পূর্বে ১১৭০টি, মিডল্যান্ডসে ১০৯২টি, মাসোনাল্যান্ড সেন্ট্রালে ৮৯২টি, মাটাবেলেল্যান্ড দক্ষিণে ৭৫০টি, মাটাবেলেল্যান্ড উত্তরে ৬৭০টি এবং সবচেয়ে কম ছিল মাসভিঙ্গো প্রদেশে ৬৫৭টি। অপরদিকে কৃষাঙ্গ কৃষকদের সর্ব্বোচ্চ জমির পরিমাণ ছিল ৩ হেক্টর করে। এবং দেশের বেশির ভাগ কৃষাঙ্গ কৃষকই ছিলেন ভূমিহীন। ফলে জিম্বাওয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না। কিউবার যেমন প্রধান রপ্তানী নির্ভর ফসল বলতে আখ উৎপাদন করা হত তেমনি জিম্বাওয়েতেও মূল রপ্তানীকারক ফসল ছিল তামাক। যার প্রায় বেশির ভাগটাই হোয়াইট ফার্মারদের খামারে উৎপন্ন হত। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রপতি মুগাবের নেতৃত্বাধীন সরকার ''ফাস্ট ট্র্যাক ল্যান্ড রিফম প্রোগ্রাম'র মাধ্যমে সে দেশের হোয়াইট ফার্মারদের ৬৪২২টি খামারের ১০.৮ মিলিয়ন হেক্টর জমি বাজেয়াপ্ত করে A1 (গ্রামের ভূমিহীন কৃষক, যারা গ্রামে পুনরায় ফিরেছে ৫ হেক্টর চাষ করতে পারে এমন ছোট চাষী এবং পরম্পরাগত চাষে বিশ্বাসী) ও A2 (যারা বাণিজ্যিক চাষ করবে এবং অবশ্যই হতে হবে সে দেশের কৃষ্ণাঙ্গ কৃষক) স্কীমের মাধ্যমে ১৩৪৪৫২ সংখ্যক ভূমিহীন গরীব কৃষাঙ্গ কৃষক পরিবারের মধ্যে ভাগ করে দেয়। সবচেয়ে বেশি খামার বাজেয়াপ্ত হয় মাসভিঙ্গো প্রদেশে ৯৯ শতাংশ, ৬৫৭টির মধ্যে ৬৪৯টি। মানিকাল্যান্ডে সবচেয়ে কম ৪৭ শতাংশ ১২৯৯টির মধ্যে ৬২২টি খামার বাজেয়াপ্ত করা হয়। কারণ মানিকাল্যান্ডের বেশির ভাগ খামার কিছু উন্নত (ডেভলপড) দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ২০০০'র এই ফাস্ট ট্র্যাক জমি পুর্নবন্টন ব্যবস্থা জিম্বাওয়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে অস্থির করে তোলে। এবং এই বিরোধটা শেষমেশ হয়ে দাঁড়ায় শ্বেতাঙ্গ বনাম কৃষ্ণাঙ্গদের। অনেক ক্ষেত্রে হোয়াইট ফার্মারদের খামারগুলো মুগাবের সমর্থনে যারা একটা সময় যুদ্ধ করেছিলেন সেই সব প্রাক্তনীদের নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা জোরপূর্বক দখল করে নেয়। যার ফলস্বরূপ রক্তপাতও অনিবার্য হয়ে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় ড্রাম বাজাতে বাজাতে... গাইতে গাইতে খামার দখল করতে চলেছে ভূমিহীন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের দল। ঠিক যেমন সত্তর-আশির দশকে বর্গা অপারেশনের সময় এ রাজ্যের বর্গাদার ভূমিহীন কৃষকেরা ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে জোতদারদের জমি দখল করতে যেত। সব মিলিয়ে জিম্বাওয়ের পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে

যে বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা শ্বেতাঙ্গরা আক্রান্ত হতে শুরু করে এবং হোয়াইট ফার্মারদের একটা বড় অংশ বাধ্য হয় দেশ ছাড়তে। বর্ণ বিদ্বেষী এই আক্রমণের জন্য প্রথম বিশ্ব দায়ী করে মুগাবেকে। এবং জিম্বাওয়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা হয় বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা। মুগাবের এই পদক্ষেপ প্রথম বিশ্বের কাছে যতই সমালোচিত হোক না কেন জিম্বাওয়ের ভূমিহীন কৃষ্ণাঙ্গ কৃষকের কাছে তিনি চোখের মণি হয়ে ওঠেন। তাছাড়া সাধারণ ভাবে মনে হতে পারে জিম্বাওয়ের যে জমির প্রকৃত উত্তরাধিকার কৃষ্ণাঙ্গরা তা দিনের পর দিন শ্বেতাঙ্গরা ভোগ করে যাবে... এই অসাম্য দূর করবার জন্য প্রেসিডেন্ট মুগাবে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা যে শুধু ঐতিহাসিক নয়, যথেষ্ট সাহসী এবং প্রয়োজনীয়। যদিও এত সবের পরও একটা 'কিন্তু' রয়ে গেছে। এটা যেমন সত্য ১৮৯০ সাল নাগাদ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গ জিম্বাওয়ানদের জমি থেকে বিতাড়িত করেছিল। বিশেষ করে সেটা ত্বরান্বিত হয় ১৮৯৬-৯৭ সালে যখন শ্বেতাঙ্গদের কাছে কৃষ্ণাঙ্গরা প্রথম চিমুরেঙ্গা যুদ্ধে পরাজিত হয়। কিন্তু মজার বিষয়টি হল, জিম্বাওয়ের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সে দেশের কালো মানুষেরা যে সবসময় সাদাদের দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত হয়েছে তা নয়। জিম্বাওয়ের কালোরা অন্য দেশের কালোদের কাছেও বার বার অত্যাচারিত হয়েছেন। আজকের জিম্বাওয়েতে যে নেডেবেলে জনগোষ্ঠী রয়েছে ১৮৩০ সাল নাগাদ তারাই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী সোনা উপজাতির মানুষদেরকে উৎখাত করে। এবং পরবর্তীতেও এই দ্বন্দ্বটা চলতে থাকে। জিম্বাওয়ের যে দুই রাজনৈতিক দল জোসুআ নকোমো'র জাপু এবং রবার্ট মুগাব'র জানু সেটাও নেডেবেলে ও সোনা এই দুই জনগোষ্ঠীরই প্রতিনিধিত্বকারী দল। এই দলের দ্বন্দ্ব যে কতটা প্রকট তা সামনে আসে ১৯৮২-৮৭তে যখন মুগাবের একম এবং অদ্বিতীয়ম্ হয়ে ওঠাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য মাটাবেলেল্যান্ডের নেডেবেলে উপজাতিকে আক্রমণ করে মুগাবের ফিফ্‌থ ব্রিগেড বাহিনী। গুকুরাহুনডি নামের সেই জাতি দাঙ্গায় সে সময় ২০০০০ নেডেবেলে উপজাতির'র মানুষ নিহত হয়। যার উভয়পক্ষেই ছিল কৃষ্ণাঙ্গরা। এত গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু জমির পুর্নবন্টন প্রক্রিয়াটি নিয়ে প্রথম বিশ্ব প্রশ্ন তুলেছে তার কারণ জমির পুর্নবন্টনে নাকি রাষ্ট্রপতি মুগাবের জন্যও বরাদ্দ হয়েছে ১৫টি খামার, একইভাবে উপ-রাষ্ট্রপতি সাইমন মুজেনডা পেয়েছেন ১৩টি খামার, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের জন্য রাখা হয়েছে ১৬০টি, জানু-পিএফ'র অন্যান্য সাংসদদের জন্য ১৫০টি এবং ২৫০০ প্রাক্তন যোদ্ধাদের জন্য মাত্র ২টি খামার বরাদ্দ হয়েছে। যাইহোক রাষ্ট্রপতি মুগাবে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। সেকারণেই এবার ফেরা যাক আমাদের গন্তব্য জিম্বাওয়ের জৈবচাষে। আসলে জৈবচাষের এই পরিস্থিতিটা জিম্বাওয়েতে কীভাবে তৈরী হল সেটা খুঁজতে গিয়েই যত কথা। তা খুঁজতে বেরিয়ে আমরা বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা অব্দি আগেই পৌঁছে গেছি। এখন বরং সেখান থেকেই শুরু করা যাক।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার যৌথ নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর কিউবার মতই জিম্বাওয়েতেও প্রবল খাদ্যসংকট তৈরী হয়। খনিজ তেলের সংকট এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় যার প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে কারখানা ও পরিবহণে। হু হু করে বাড়তে শুরু করে বেকারত্ব। কাজের সন্ধানে প্রায় ৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যায়। মুদ্রস্ফীতির হারও সাংঘাতিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ে। কলেরা, টাইফয়েড, হাম'এর মত অসুখ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। ২০০৮-এ শুধু কলেরাতেই মারা যায় ৪০০০ মানুষ। এবং আক্রান্তের সংখ্যা ১০০০০০ ছাড়িয়ে যায়। সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা হয়েছে এইডস্‌এর কারণে। প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে। দেশের ৩৪ শতাংশ মানুষ এইডস্‌ আক্রান্ত যাদের বয়স ১৫-৪৯। সারা পৃথিবীর মধ্যে এদেশের মানুষের আয়ুই সবচেয়ে কম। আসলে জিম্বাওয়ে জুড়ে যা যা ঘটে চলেছে, এই যে একের পর এক সংকটময় পরিস্থিতি... এটা অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ ছোট যে কোন দেশের ক্ষেত্রে এরকমটাই ঘটে, অন্ততঃ ইতিহাস তাই বলে। তাছাড়া এই ধরণের আমদানী নির্ভর দেশ যাদের জ্বালানী তেল থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সবকিছুর জন্যই অন্যের কাছে হাত পাততে হয় তারা যে ২০০০'র আগেও খুব একটা স্বনির্ভর ছিল না সেটা বর্তমান পরিস্থিতিই বলে দেয়। সুতরাং এরকম একটা প্রতিকূল অবস্থা থেকে বিশেষত কৃষি ক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য, শুধুমাত্র খাদ্যে স্বনির্ভরতা নয় খাদ্যে সার্বভৌমত্ব হবার জন্য যে লড়াইটা তারা শুরু করেছেন তা জিম্বাওয়েকে এক অন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছে।

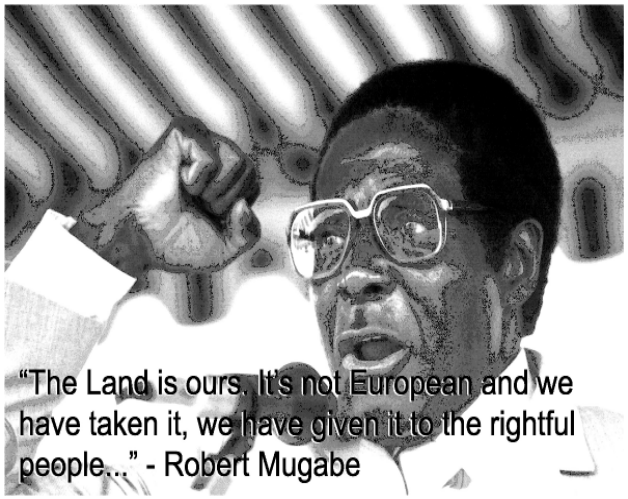

অবরোধের পর কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় যে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, উন্নত প্রজাতির বীজ, ট্রাক্টর ও বিভিন্ন ধরণের হারভেস্টর যা এতদিন পশ্চিমি দেশ থেকে সাহায্য হিসেবে পাওয়া যেত বন্ধ হয়ে গেল সব কিছু। ফলে বাধ্য হয়েই স্থানীয় যে পরম্পরাগত কৃষি পদ্ধতি ছিল, সারা জিম্বাওয়ে জুড়ে শুরু হল তার খোঁজ। (যে পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণের সাহায্যেই তৈরী করা যাবে সার। ফেরানো যাবে জমির উর্বরতা।) সারা জিম্বাওয়ের ছোটো জোতের চাষীদের নিয়ে গড়ে উঠল জিম্বাওয়ে স্মল অর্গানিক ফারমারস্ ফোরাম (ZIMSOFF)। যাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন ছোটজোতের চাষীদের নিয়ে সংগঠন তৈরী করে সেইসব সংগঠনের মধ্যে একটা প্রাণবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা যা কিনা আসলে জৈবচাষ এবং তার বিপণনকে ত্বরান্বিত করবে। আর এসবকে বাস্তবায়িত করার জন্য কৃৎকৌশল হিসেবে তারা গ্রহণ করে

'Participatory ecological land use planning and management' প্রোগ্রাম। এটি মূলত 'Participatory learning & action' এই ধারণাটির ওপর দাঁড়িয়ে হয়েছে। চল্লিশের দশকের কোনও এক সময় চীনদেশের Jammi Yen এই ধারণাটি সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন, যার মূল বক্তব্য হলো— মানুষের কাছে যাও, তাদের সঙ্গে থাক, তাদের কাছ থেকে শেখ, তাদের সেবা কর, আন্তরিক হও, তাদের সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা কর, তাদের যা কিছু আছে তাই দিয়েই শুরু কর এবং যা কিছু আছে তার ওপর নির্ভর করেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত কর। (Go to people, Live with them, Learn from them, Serve them, Love them, Plan with them, Start with what they have and Build on what they have)। জৈবচাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জিম্বাওয়ের মানুষ সেই পথই অনুসরণ করেছে। সেই কর্মকান্ড বোঝাবার উদ্দেশ্যে উদাহরণ হিসেবে মাসভিঙ্গে প্রদেশকেই বরং এখানে তুলে ধরা যাক।

ZIMSOFF ১৯০০০ ছোটজোতের কৃষক সংগঠনকে একই ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে, যারা পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চল এই চার আঞ্চলিক দলে বিভক্ত। প্রতিটি অঞ্চলে আবার ৪৬টি করে ক্ষুদ্রজোতের চাষীদের সংগঠন (Smallholder Farmer Organizations) রয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে মধ্যাঞ্চলের একটি সংগঠন হল 'শশী' যেখানে এগ্রোইকোলজির একটি স্কুল রয়েছে। ওই সংগঠনের প্রত্যেক সদস্যই ২০০০ সালে জিম্বাওয়ে সরকার যে ভূমিসংস্কার নীতি গ্রহণ করেছিল তাতে উপকৃত। সরকারীভাবে সেই সংখ্যাটা ৩৮০, যাদের সেই সময় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। শশী ব্লকের ওই খামারটির সম্মিলিত জমির পরিমাণ ১৫০২০ হেক্টর। যার ২৩ শতাংশ বসবাস ও চাষবাসের জন্য এবং বাকিটা পশুচারণের জন্য। সাধারণত ওটা শুষ্ক অঞ্চল, বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০ মিলিমিটার। মাটি বেশ পরিণত। কোথাও দোঁয়াশ, কোথাও লালচে এঁটেল, আবার কোথাও বা এই দু'য়ের মিশ্রণ। আগে হোয়াইট ফার্মাররা এই অঞ্চলটা পশুখামারের জন্য ব্যবহার করত। পুনর্বাসন পাওয়া কৃষকেরা পরিবর্তিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে। তারা একই সাথে গবাদি পশুপালনের সাথে সাথে ফসলও ফলাচ্ছে। মিশ্রচাষের এই পদ্ধতিতে একদিকে পশুর বর্জ্য জমিতে যাবে এবং অন্যদিকে জমি থেকে পশুর খাবার আসবে। পারস্পরিক নির্ভরতার একটা ব্যবস্থাপনা যেটা আগে ছিল না।

শশী খামারের কৃষকেরা খাদ্যে সার্বভৌমত্ব আনবার জন্য বিভিন্ন ধরণের বাস্তুতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা শুরু করেন। যাতে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবকে প্রশমিত করা যায় এবং বাইরে থেকে আমদানী করা চাষের উপকরণের থেকে নির্ভরতা কমিয়ে আনা যায়। ফলে খামারের আয়কে নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে। প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে আয়টা টেকসই হয় তার জন্য জমিতে জৈবসার প্রয়োগ করা, চাষের জমি ঢেকে রাখা, যতটা কম সম্ভব চাষ, মিশ্র ফসল চাষ, পরম্পরাগত বীজের ব্যবহার, বিনিময় এবং মুক্তনিষেক ঘটাতে পারে এই ধরণের প্রজাতিকে নির্বাচন এবং আরো বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে।

শশী স্মলহোল্ডার ফার্মাস অর্গানাইজেশনের কৃষকেরা জমি ও বাগানের উর্বরতার জন্য মূলত গরু এবং ছাগলের বর্জ্যই ব্যবহার করেন। সাধারণত সার তৈরীতে ফসলের অবশিষ্টাংশ বিশেষত ভুট্টা, তারা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। পশুদের থাকার জায়গায় ভুট্টার শুকনো গাছের অংশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, দু'তিন দিন পর পর এই শুকনো পাতার মধ্যে গাবদি পশুরা যে চোনা ও গোবার ত্যাগ করে সব শুদ্ধ সেগুলো বের করে জমিতে দেওয়া হয়। এটা একটা প্রাচীন পদ্ধতি, যা আমাদের দেশেও গোয়ালে গরুর শোবার জায়গায় কোথাও কোথাও এখনও খড় ছিটিয়ে দেওয়া হয়... তিন-চারদিন পর গোবর আর চোনায় যখন দেখা যায় খড় ভিজে গেছে গরু আর থাকতে পারছে না তখন বার করে জমিতে দিয়ে দেওয়া হয়। পরম্পরা পদ্ধতির কী আশ্চর্য মিল! আফ্রিকার জিম্বাওয়ে থেকে এশিয়ার ভারতবর্ষ সর্বত্রই এক সুতোতে গাঁথা। কোন কোন কৃষক আবার পোলট্রির বর্জ্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের গাছ-গাছালির অংশ মিশিয়ে উন্নতমানের কম্পোজসার তৈরী করেন। এগ্রোইকোলজি স্কুলের চাষীভাইরা আবার তরল সারও ব্যবহার করেন। ৪০-৫০ কেজি তরলসার তৈরী করে তার সাথে নাইট্রোজেন বাড়াবার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিম্বগোত্রীয় গাছের পাতা একটা বস্তার মধ্যে ভরে ৩০০ লিটার জলের একটা ড্রামের মধ্যে ১০-১৪ দিন চুবিয়ে রেখে তরল সার তৈরী করে। তারপর প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি মিশ্রিত ওই সারের সঙ্গে জল মিশিয়ে পাতলা করে সেই অবশেষ তারা ফসলক্ষেতে চাপান হিসেবে দেয়।

কিছু কিছু কৃষক তরল সার তৈরী করার সময় অক্সিজেনমুক্ত একটা পরিবেশ তৈরী করে তাতে আগাছার বীজগুলো ধ্বংস হয়। এবং সাথে সাথে নাইট্রোজেনের পরিমাণ ১-৩ শতাংশ বেড়ে যায়। এই তরল সার আগাছামুক্ত, ঠান্ডা এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। শশী খামারের একজন কৃষক মিসেস মুডজিংওয়া জানান, রাসায়নিক সারের মতই এই তরল সার ব্যবহার করলে গাছের বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়। তাদের ফসল যে কোন রাসায়নিক সারে পুষ্ট ফসলের সঙ্গে সহজেই পাল্লা দেবে। সে কারণে বেশি পয়সা খরচ করে রাসায়নিক সার কেনার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করে না। এছাড়াও তিনি বলেন, রাসায়নিক সারের মধ্যে যে নাইট্রেট থাকে তার একটা বড় অংশ জলে ধুয়ে চলে যায় কারণ ওই নাইট্রেট সহজেই জলে দ্রবীভূত। তিনি আরো বলেন একজন কৃষকের

কাজ মাটির পুষ্টি বাড়ানো, যে মাটি গাছের পুষ্টি বাড়াবে।

কৃষিবীজে সার্বভৌমত্ব লাভ করার জন্য শশীর কৃষকভাইরা জিম্বাওয়ের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে দেশীয় বীজ এবং মুক্ত নিষেক ঘটায় সেই ধরণের প্রজাতি সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মি. মপোফু এবং তার স্ত্রী এলিজাবেথ (লা ভিয়া ক্যাম্পেসিনার কোয়ার্ডিনেটর), বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরণের বীজ বিভিন্ন কৃষকের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে প্রজাতির বিস্তার ঘটাচ্ছেন। তাঁদের কাছে ১৫টির ওপর বিভিন্ন ধরণের ভুট্টার প্রজাতি, মিলেট, বিনস, মিষ্টিকুমড়া, তরমুজ, বরবটি এবং বিভিন্ন ধরণের দেশীয় শস্য রয়েছে। বেশিরভাগ বীজই স্মল হোল্ডার ফার্মাস অর্গানাইজেশনের কৃষকদের মধ্যে বিনিময় করা হয়। এগ্রোইকোলজির সেই স্কুল স্থানীয় সব্জি চাষের জন্য বীজ তৈরীর পাশাপাশি কৃষক থেকে কৃষকের মধ্যে যাতে জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা।

বেশির ভাগ কৃষকরাই এলাকার শুষ্কতা ও অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বেশ কিছু অসংরক্ষিত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেমন, মি. আবমেলেক মুটসেনহুরের বাড়িটা একটা পাথুরে ঢালের ওপর। ঢাল বেয়ে যাতে দ্রুত জল বেরিয়ে যেতে না পারে তিনি তার জন্য ঢাল বরাবর আল দিয়ে দেন। এবং যতটুকু চাষ না দিলে নয় তিনি ততটুকুই চাষ দেন। মাটি যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় সেজন্য তিনি মাটিকে খড় জাতীয় কিছু দিয়ে ঢেকে রাখেন এতে মাটির ওপরের অংশের জল বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া বৃষ্টির জলটাও থেকে যায় এবং পরের মরসুমে বীজ বপন করতে সুবিধে হয়। সাধারণত দীর্ঘ শুখা মরসুমেও এই পদ্ধতিতে গাছ বেড়ে ওঠে। চারাগাছগুলো যখন হাঁটু অব্দি বড় হয়ে যায় তখন ভুট্টার খড় মালচিং-র কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি একই জমিতে একসাথে অনেকগুলো দেশীয় ফসল চাষ করেন। তাঁর এই বহু ফসলি চাষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য হল, এইভাবে চাষ করার ফলে কোন একটা ফসল খারাপ হলেও অন্যগুলির ফলনে তা যেন পুষিয়ে যায়। পাশাপাশি পশুদের খাবারটাও চলে আসে।

শশীর কৃষকেরা ভুট্টা, শালগম, বরবটি, মিলেট, সূর্যমুখী, বিনস্, মিষ্টিকুমড়া, তরমুজ এরকম দশ ধরণের ফসল চাষ করতেন। শশীর বেশির ভাগ কৃষকই বাড়ির সঙ্গে লাগানো কিচেন গার্ডেনে সব্জি হিসেবে টমেটো, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ চাষ করেন তাদের খাবারের জন্য।

তাছাড়া শশীর সদস্যরা বিভিন্ন ধরণের পশুপালন করেন, যেমন— গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, গাধা, হাঁস-মুরগী, টার্কি, গুয়না, মাছা খরগোশ। চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন, একের অন্যের ওপর যে নির্ভরশীলতা গড়ে উঠেছে তা শশীতে দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। একদিকে যেমন ফসলের অবশিষ্টাংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে পশুর বর্জ্য জমিতে সার হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি পশুকে জল তোলার কাজেও ব্যবহার করা হয়।

২০০২ সালে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়ন নিয়ে জোহান্সবার্গে যে শীর্ষ বৈঠক হয়েছিল সে সময়ই এই পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল জোনটা তৈরী হয়। ZIMSOFF এমন একটা সংস্থা যেখানে সমস্ত ধরণের দেখভালের দায়িত্ব ছোট কৃষকরাই করে থাকেন। ক্ষুদ্রজোতের কৃষকদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ন এবং তাদের স্বনির্ভর করাই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। যাতে তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে। চাষাবাদ করতে গিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত যে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছে তা একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মত কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এই ফোরাম একজন কৃষকের সাথে অপর কৃষকের দেখা সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়ে কাজের মধ্যে দিয়ে শেখার মাধ্যমে সেই কাজটাই করছে। গত দশ বছর তাঁরা চারটি অঞ্চলেই মৌলিক প্রশিক্ষণের পরিকাঠামো ও সুবিধে গড়ে তুলেছেন।

২০১১ সালের জুনে লা ভিয়া ক্যাম্পেসিনার ব্যবস্থাপনায় শশীতে প্রথম এগ্রো-ইকোলজির প্রশিক্ষকদের প্রথম মিটিং হয়। ওই মিটিং-এ কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়। তারপর থেকে তারা কৃষককে কৃষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করে চলেছেন।

ঠিক একই ধরণের এরকম প্রশিক্ষণের কাজ চালাবার জন্য মোজাম্বিক, মালি, নাইজেরিয়ায়, এগ্রো-ইকোলজি স্কুল তৈরীর কাজ চলছে নিউ ফিল্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে। মূলত যুবক এবং মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই মূল লক্ষ্য। শশী এগ্রো-ইকোলজি স্কুল সুস্থায়ী কৃষি, সংহতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার এবং স্থানীয় জ্ঞান ও উপকরণের মাধ্যমে কীভাবে কৃষির উন্নতি ঘটান যায় সে বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেবার জন্য স্থানীয় অঞ্চলের কৃষকদের আমন্ত্রণ জানায়। এই প্রশিক্ষণের জন্য একটি পাঠক্রমও তৈরী করেছে PELUM (Participatory ecological land use management) এবং সেই পাঠক্রমের চূড়ান্ত রূপদান করে ILEIA (Centre for information on law External Input and Sustainable Agriculture)। Learning Agriculture শিরনামে ওই প্রশিক্ষণটির মূল বিষয় হল খরা, বন্যা, ঝড় এইরকম প্রাকৃতিক চরম অবস্থা সহ্য করতে পারে এমন চাষাবাদ এবং বিশ্ব উষ্ণায়নকে যুঝতে পারে এমন আবাদ কৌশলের ওপর এবং কীভাবে মাটিতে জৈব উপাদান বৃদ্ধি পেতে পারে সেইসব বিষয়ে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল কৃষকদের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্মেষ ঘটান যা তাদের প্রগতিশীল করে তুলবে। এই স্কুলগুলির আরেকটি লক্ষ্য হলো জিম্বাওয়ের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রক ও ন্যাশনাল ফাউন্ডেশান সার্টিফিকেটের অনুমোদন আদায় করা এবং জিম্বাওয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়া যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এর সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারে। এই স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষণ দেবে সেই সব বিশিষ্ট চাষিরা যাদেরকে পান্ডিত্য এবং দক্ষতার নিরিখে নির্বাচন করবে স্থানীয় কৃষক সম্প্রদায়। আগামীদিনে প্রতিটি ছোট জোতের জমিই হয়ে উঠবে বাস্তুতান্ত্রিক এবং সুস্থায়ী কৃষিব্যবস্থার 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' (Centre for excellence on agro-ecology and sustainable agriculture)।

শশী বা ZIMSOFF'র মত আরেকটি সংগঠন মাকোনী জৈব কৃষক সংগঠন (MOFA) যাদের কথা না বললে জিম্বাওয়ের জৈবচাষের এই বৃত্তটা সম্পূর্ণ হবে না। রাজধানী হারারে থেকে ৪০ কিমি পূর্বে অবস্থিত এই সংগঠনটি ২০১৪ সালের ৫ই জুন UNDP'র দেওয়া ইকুয়েটর পুরস্কার পায়। ২০০৭-এ মোফা মাকোনীর একটি স্থানীয় অসরকারী সংস্থা অর্গানিক নেটওয়ার্ক সংস্থার সহযোগিতায় প্রথম কাজ শুরু করে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল মাকোনী এলাকার কষকদের মধ্যে জৈবচাষ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ চালান। কৃষকদের সংঘবদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের মধ্যে সেই জাগরণ তাঁরা ঘটাতে পেরেছিল যার ফলে কৃষকেরা তামাক ছেড়ে অন্য বিকল্প জৈবচাষের দিকে ঝোঁকে। ২০১১ সালে তাঁরা UNDP'র পক্ষ থেকে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটিস স্মল গ্রান্ট প্রোগ্রাম (GEFSGP) নামে ৫০০০০ অর্থমূল্যের একটি অনুদান পায় যার সাহায্যে তাঁরা কৃষকদের মধ্যে জৈবচাষের সম্প্রসারণ ঘটাতে সমর্থ হয়। সে সময় তাঁরা সাতটি জৈববাগান তৈরী করে এবং জৈবচাষের ওপর অনেকগুলো প্রশিক্ষণ পায়।

UNDP থেকে পাওয়া ওই অনুদানটির মূল শর্ত ছিল স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপাদান এবং শ্রম এই দুইয়ের সাহায্যেই সম্পদ তৈরী করতে হবে। ২০১২তে ওই প্রকল্পের শেষে ZOPPA (জিম্বাওয়ে অর্গানিক প্রোডিউসার এবং প্রোমোটারস্ অ্যাসোশিয়েশন) জৈবচাষী হিসেবে কৃষকদের শংসাপত্র দেয়। ZOPPA, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর অর্গানিক এগ্রিকালচারাল মুভমেন্ট (IFOAM)'র অধীনে একটি সংস্থা যারা স্থানীয়ভাবে জিম্বাওয়েতে জৈব শংসাপত্র এবং জৈব হিসেবে নথিভুক্ত হবার সম্মতি দেয়। এই শংসাপত্র MOFA কে একটা বড় সাফল্য দিয়েছিল কারণ ওই শংসাপত্রের দৌলতেই তাঁরা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়। সুস্থায়ী জমি ব্যবহার, নারী-পুরুষ সকলকে মূলস্রোতে আনা এবং খাদ্যসুরক্ষার মধ্যে সংহতি স্থাপনের কাজটা তাঁরা করেছিলেন। বিভিন্ন ধরণের কৃষিকাজের সাহায্যে MOFA ওই অঞ্চলের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকার জন্য যে ক্ষমতা অর্থাৎ resilience বাড়াতে পেরেছিল। তাঁরা সেখানে শুষ্ক জমিতে জৈবচাষ, শাকসব্জি চাষ, ফুলচাষের নার্সারী তৈরী, মাশরুম চাষ, মৌ-পালন এবং এগ্রো-ফরেস্ট্রি তৈরীর মত কাজ করেছিল। MOFA জিম্বাওয়ের কৃষিনীতি তৈরীতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ২০১৪তে ইকুয়েটর পুরস্কারের জন্য ১২১ দেশ থেকে পাঠান ১,২৩৪ টি নমিনেশনের মধ্যে ৩৫টি সংগঠন পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় যার মধ্যে MOFA একটি। পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে ৫০০০ ইউ. এস. ডলার এবং 'বিশেষভাবে স্বীকৃত' ক্যাটাগরিতে যে ১৫০০০ ডলার পেয়েছিল তা দিয়ে তাঁরা ৭টি বাগানকে ০.৪ থেকে ২ হেক্টরে সম্প্রসারণ করে ঘেরা দেবার জন্য সরঞ্জাম কেনে, বাকি টাকা দিয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরী এবং প্রাত্যহিক বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

জিম্বাওয়ের কৃষির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল কৃষিতে নারীদের স্বীকৃতি। গ্রামীণ এলাকায় জমির বেশিরভাগ অংশীদারত্বই নারীদের। মূলত কৃষিকাজটা তাঁরাই করেন। বেশির ভাগ পুরুষই কাজের জন্য শহরে থাকেন। সে কারণে গ্রামীণ এলাকায় মহিলারাই কৃষিসংক্রান্ত সমস্ত কাজ করে থাকেন। বর্তমানে জিম্বাওয়ে সরকার যে নীতি নিয়েছেন তাতে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অধিকার এমনকি সংসদেও কিছু সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে তাদেরকে ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনিক স্তরেও যে বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে সেখানেও তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। অনেক সংগঠনেরই চেয়ারপার্সন একজন মহিলা। তাঁরা তৃণমূলস্তর থেকেই উঠে এসেছেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে তাঁরাই প্রতিনিধিত্ব করছেন। সরকার এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে যাতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে তার ব্যবস্থা সরকার করেছে।

শুধু জিম্বাওয়ে নয়, জিম্বাওয়ে সহ আফ্রিকার অন্যান্য অনেক দেশই জৈবকৃষির প্রসার নিয়ে ভাবনা ভাবতে শুরু করেছে। কারণ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় যে বাজারগুলো আছে সেগুলো ধরার জন্যই এটা করতে হবে। যার ফলে দেশের আয়, কর্মসংস্থান ও জীবন-যাপনের মান উন্নয়ন সমস্ত কিছু ঘটা সম্ভব।

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অর্গানিক এগ্রিকালচারাল মুভমেন্ট IFOAM'র আফ্রিকার প্রতিনিধি মোসেস মুয়াঙ্গা জিম্বাওয়ের ন্যাশনাল অর্গানিক স্ট্যান্ডার্স স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালায় এসে বলেন, ''বাজারের দিকে লক্ষ রেখেই জৈবকৃষি মূল্য শৃঙ্খল করতে হবে। তার মাধ্যমেই লক্ষ লক্ষ কৃষকের জীবিকার উন্নতি করা সম্ভব। কৃষকদের চাই কাজ, সেকারণে যদি তারা বাজার ধরতে না পারে তবে তাদের জীবিকাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকারী, বেসরকারী সংগঠন এবং দেশের জৈব আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত সকলে কৃষকদের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক স্থাপনে সহায়কের কাজ করবে। জিম্বাওয়ে সহ আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলিতে জৈবকৃষিতে উন্নত করা সম্ভব কারণ সেখানে তাদের পরম্পরাগত কৃষি ব্যবস্থা আছে তার সাথে জৈবকৃষির একটা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন রয়েছে। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বাজারগুলোতে উচ্চ দাম সম্পন্ন জৈব খাদ্যবস্তুর বাজার দ্রুতগতিতে বাড়ছে, এই বৃদ্ধির হার বছরে ১০-২৫ শতাংশ। যার পুরোটাই আমদানী করা হয় উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে। এখনকার দিনে আন্তর্জাতিক বাজারের উপভোক্তারা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্য যেটা পরিবেশগত এবং সামাজিক ভারসাম্যকে ক্ষুণ্ণ না করে তৈরী হয়েছে, সেই ধরণের পণ্যের প্রতি তারা বেশি আগ্রহী। যার ফলস্বরূপ এই ধরণের জৈব উপাদানের চাহিদা এবং বিপণন ভীষণ বেড়েছে এবং পরিবেশবান্ধব উপাদানগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কৃষক এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে যোগাযোগ হওয়াটা জরুরী। এর ফলে উগান্ডায় জৈবকৃষি সাফল্য লাভ করেছে। জৈব বাণিজ্যকরণকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য উগান্ডার কাছে শেখার মত বিষয় হল জৈবচাষের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন''।

আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে উগান্ডাতে জৈবকৃষি অন্যতম দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠা একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। উগান্ডাতে ২ লক্ষ স্বীকৃত জৈবকৃষক রয়েছেন এবং ৪৫টি নথিভুক্ত রপ্তানী বাণিজ্যিক কোম্পানী রয়েছে যাদের বছরে রপ্তানীর পরিমাণ ৩ কোটি আমেরিকান ডলার। এই বাজার বৃদ্ধির একটি কারণ যদিও বা হয় উগান্ডার জন্য ইউরোপের বাজার খুলে যাওয়া। তবে সেই সঙ্গে দেশীয় বাজারের বৃদ্ধিও উগান্ডাতে হয়েছে ৫০ শতাংশ হারে। আফ্রিকাতে ৪১৭০০০ হেক্টর নথিভুক্ত জমিতে ৪ লক্ষ কৃষক জৈবচাষ করে থাকে। জিম্বাওয়ে ছাড়া যে সব দেশ জৈবচাষ করে থাকে সেগুলো হল উগান্ডা, তিউনিশিয়া, দঃ আফ্রিকা এবং তানজেনিয়া। এবং উৎপাদিত শস্যগুলি হল, জলপাই, কফি, পামতেল, তুলো এবং কোকো। তবে জিম্বাওয়ে সহ এইসব দেশে জৈব উৎপাদনের অনেকটা অংশই হচ্ছে ইনফরমাল সেক্টরে। যা সরকারীভাবে স্বীকৃত বা নথিভুক্ত নয়।

তবে উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপের এই বাজার প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা না বললেই নয়। প্রথম কথা হল যে বাজারকে সামনে রেখে মি. মোয়াঙ্গা একটা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবার কথা বলেছেন সেটা নিয়ে কিন্তু ভাববার একটা জায়গা রয়েছে। হ্যাঁ, জৈবকৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অবশ্যই একটা বাজার যেমন প্রয়োজন তেমনি একমাত্র সেই বাজারের ওপর অতি নির্ভরশীলতাও কিন্তু আগামীতে আত্মহত্যার সামিল হতে পারে। কারণ দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদ বা নয়া সাম্রাজ্যবাদের যে সব কীর্তি এখনও আমরা স্মৃতিতে বয়ে বেড়াচ্ছি তা থেকেই জানি একটা সময় পর্যন্ত ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা তাদের প্রয়োজনে আমদানিটা চালিয়ে যাবে। কিন্তু যেই মুহূর্তে তারা দেখবে তাদের আমদানি সে দেশের অর্থনীতিকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করছে তখনই তারা বিভিন্ন শর্ত আরোপের কাজটা শুরু করবে। এবং সেই শর্ত আরোপের পরিমাণটা দিনকে দিন বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যখন সে দেশের সার্বভৌমত্বকে হয় বিকিয়ে দিতে হবে নয়তো দেশকে একটা চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। তাছাড়া জৈব বাজারের প্রতিযোগীর সংখ্যা

আজকে কম আছে কিন্তু দিনকে দিন সেই সংখ্যাটা তো বাড়বে তখন তো এমনিতেই চাহিদা কমবে, স্বাভাবিকভাবেই দামও পড়বে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক ভিত বা মেরুদন্ড গড়ে তুলতে গিয়ে বাজার অর্থাৎ অন্য দেশের ওপর কতটা পর্যন্ত নির্ভরশীল হবো অবশ্যই সেদিকেও সর্তক থাকা প্রয়োজন।

এতক্ষণ জিম্বাওয়ের জৈবকৃষি নিয়ে শোনার পর কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারেন, জৈবকৃষিতে জিম্বাওয়ে যদি এতটা সফলই হবে তবে ২০০০ সালের আগে তারা যে উৎপাদন করত সেই উৎপাদনমাত্রা কি এখন ছাড়াতে পেরেছে? পারেনি, বরং তার চেয়ে অনেক কম উৎপাদন করছে। ঠিকই ২০০০'র আগে তারা যে পরিমাণ তামাক উৎপাদন করেছে ২০০৯ বা ২০১২'র পরিসংখানে সেই সংখ্যাটা ৪৭ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ। ভুট্টার ক্ষেত্রেও সেটা ৩১ শতাংশ। কিন্তু জৈবচাষ করে কেন ওই লক্ষ্যমাত্রাটা পৌঁছানো গেল না? তবে কি চাষ পদ্ধতি পাল্টে ফেলে জৈবের বদলে রাসায়নিক চাষ করলেই ওই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যেত? না, তাতে সেটা সম্ভব হত না। কারণ গত ১০-১৫ বছরে গোটা জিম্বাওয়ের কৃষির চেহারারাই গঠনগত বদল ঘটে গেছে। যে তামাক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমাদের এই পর্বের বাগবিতন্ডা শুরু হল মনে রাখতে হবে সেটাই ছিল জিম্বাওয়ের প্রধান রপ্তানীকারক ফসল। এবং এই তামাকের বেশির ভাগটাই উৎপাদন হত হোয়াইট ফার্মারদের খামারে। যার এক একটার আয়তনই ছিল ৩০০০ হেক্টরের কাছাকাছি যেখানে এখন ওই ধরণের বাণিজ্যিক খামারের আয়তন ২৫০ হেক্টরে নেমে এসেছে। না, আয়তন কমে যাওয়া মোটেই উৎপাদন কমে যাবার কারণ নয়, আসলে উৎপাদন কমে যাবার মূল কারণটা হল আগে ওই তামাক বা ভুট্টা উৎপাদন করার জন্য হোয়াইট ফার্মারদের খামারগুলো পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ঋণ পেত। ঋণের একটা বড় অংশ তারা কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ, যন্ত্রপাতি, বিশেষত সেচের পেছনে অর্থাৎ পাম্প হাউস বসানো, জল পাঠাবার জন্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির জন্য খরচ করতে বাধ্য হত। কারণ জিম্বাওয়ে খুবই খরাপ্রবণ অঞ্চল। প্রত্যেক দু'তিন মরসুম অন্তর একবার খরা হবেই। যদি খরা না হয় তবে বন্যা হবেই। যদিও জিম্বাওয়েতে প্রচুর পরিমাণ নদী রয়েছে। বর্ষার মরসুমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীগুলো বন্যা প্লাবিত হয়ে যায়। দু'মাস পরেই তারা আবার শুকিয়ে গিয়ে খরা পরিস্থিতি তৈরী করে। এদিকে নতুন ভূমিসংস্কার নীতি এবং অবরোধের কারণে বাইরে থেকে লগ্নি পুঁজি আসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য চাহিদাগুলো অনেকাংশে মেটানো গেলেও জলসংকট তো দূর হয়ে যায়নি। ফলে তার প্রভাব গিয়ে উৎপাদনে পড়ছে। ২০০০'র আগে পেট্রো-রসায়ন প্রযুক্তি নির্ভর যে কৃষি ব্যবস্থাটা ছিল সেটায় বয়স ৪০-৫০ বছর যেখানে নতুন জৈবকৃষির বয়স মাত্র একদশক। ফলে রাসায়নিক চাষে মাটি যতটা নষ্ট হয়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করবার জন্য একটা সময় তো আমাদের দিতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা এটা মনে রাখা দরকার যখন কোন দেশে এম্বার্গো চলে তখন তার প্রভাব একটা ট্রাক্টরের ওপরে গিয়েও পড়ে। কারণ ট্রাক্টরটা যে জ্বালানী তেল দিয়ে চলে তার আমদানীও যে তখন বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং কৃষিতে উৎপাদন তো কমবেই। কিন্তু জিম্বাওয়ের কৃষির গঠনগত পরিবর্তনে যে উৎপাদনের জন্য ট্রাক্টরের প্রয়োজন হয় না। যে উৎপাদনের জন্য সেচের প্রয়োজন হয় না, যে উৎপাদন পরম্পরাগত পদ্ধতি মেনে সহজেই করা যায়, যে উৎপাদন ছোট জোতের কৃষকরা আগ্রহের সাথে করেন সেই দানাশস্যের উৎপাদনে জিম্বাওয়ে জুড়ে কিন্তু অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। বর্তমানে দানাশস্যের বৃদ্ধির হার ১৬৩ শতাংশ। এখানে উল্লেখ করার মত বিষয় আগে জিম্বাওয়ে জুড়ে যে কৃষিটা চলত সেটা শুধুই তামাক চাষ বাকিটা ভুট্টা। অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন মানে ফসলবৈচিত্র্য ছিল না বললেই চলে অর্থাৎ সেখানকার কৃষি সংস্কৃতিটা ছিল 'মনো ক্রপিং'। কিন্তু বর্তমানে যে বৈচিত্র্যময় কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে তা হিসেব করলে দেখা যাবে আগে যে পরিমাণ জমি তামাক চাষের জন্য ব্যবহৃত হত এখন সেটা যে শুধু কমেছে তাই নয় সেই জমিগুলোতেই অন্যান্য ফসল চাষ হচ্ছে। আর পরম্পরাগত জৈবকৃষি মানেই তো ফসলবৈচিত্র্য। খাদ্যে স্বনির্ভরতা, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এসবের মানেও তো বৈচিত্র্যময় কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থা। জিম্বাওয়ে এখন যে পথে হাঁটছে। তাছাড়া এই যে আমরা কথায় কথায় সংখ্যাতত্ত্বের উদাহরণ দিই, উৎপাদন বাড়া-কমার যুক্তি দিই, সেটা বোধহয় সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে কৃষিতে, কারণ কৃষিতে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড নেই বললেই চলে যেটা শিল্পে আছে। আমি প্রতিদিন যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করি আমার ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে তার পরিমাণ কখনই বাড়ানো সম্ভব নয় ফলে চাহিদা প্রায় নির্দিষ্ট। আসলে কৃষিকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই যত বিপত্তি। সে এ দেশের নীলচাষই হোক বা কিউবার আখচাষই হোক বা কলম্বিয়ার কলাচাষই হোক বা বলিভিয়ার কোকোচাষই হোক বা জিম্বাওয়ের তামাকচাষই হোক।

জিম্বাওয়ে বা আফ্রিকার জৈবচাষ বিষয়ে আর একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ২০১৪তে আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে 'আফ্রিকার জন্য জিন প্রযুক্তিগত কৃষি'— এই শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে জিন প্রযুক্তির সুবিধার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয় আফ্রিকার মানুষের দারিদ্র, খাদ্য সংকট এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের মোকাবিলা একমাত্র জিন প্রযুক্তিগত কৃষির মাধ্যমেই করা সম্ভব। IFPRI'র ডিরেক্টর জেনারেল শেনগন ফান বলেন, ''বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে জৈবপ্রযুক্তি এমন একটি প্রযুক্তি যার সাহায্যে কৃষি অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্যসুরক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব।'' রিপোর্টে আরো একটি কথা উল্লেখ করা হয় যেখানে বলা হয়, আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশই জিনপ্রযুক্তি গ্রহণের বিষয়ে আগ্রহী নয়। এবং জৈবপ্রযুক্তির যোগ্যতা নিয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে যেমন জিম্বাওয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে জৈবচাষের সাহায্যে একটা দেশ খাদ্যে স্বনির্ভর হতে পারে। আফ্রিকান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এবং IFPRI'র রিপোর্ট প্রকাশের পর জিম্বাওয়ের জৈবকৃষি নিয়ে বোধহয় আর কিছুই বলার থাকে না। শুধু এটুকুই বলার আগামীতে কোন প্রলোভন বা প্রবঞ্চকের ফাঁদে পা দিয়ে তাঁরা যেন দিকভ্রষ্ট না হয়। তাঁরা যদি নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারে তবে দেশটা আফ্রিকার 'রুটির ঝুড়ি' হিসেবে আগামী দশকগুলোতে গড়ে উঠবে।

ঋণস্বীকার : দেবাশিস বিশ্বাস, রূপক কুমার পাল

তথ্যসূত্র :

1.Celebrating organic farming in Zimbabwe 2. **Shashe Smallholder Farmer Organisation (SFO): a true centre of agro-ecology**3.Zimbabwe: Organic farming critical for development 4.**ZIMSOFF and the Shashe Agro-Ecology School in Zimbabwe**. 5. Small-scale Organic Farming in Zimbabwe and its Challenges.6. **Zimbabwe's agrarian revolution a success despite sanctions.7. ZIMSOFF farmers review the implications of the proposed regional seed laws**.8. Zimbabwe's New Agriculture Policy Expected To Maximise Food Production.9. Zimbabwe: President Mugabe's new attack on white farmers.10.speach of Nelson Mudzingwa.11.G.M.or organic:The choice before African Nations.12.Has Zimbabwe's land reform actually been a success?13.Zimbabwe takes back its land.14.Post-Independence land reform in Zimbabwe(controversies and impact on the economy).etc.

জিন পরিবর্তিত শস্যের বিপদ

শুভ্রকেতন বসু

একথা অনস্বীকার্য যে জীববিজ্ঞানের উন্নতির এক পরমাশ্চর্য নমুনা হল জিন পরিবর্তিত জীব বা ইংরাজীতে Genetically Modified Organism (GMO)। এই জিন পরিবর্তিত জীব বা GMO আর নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় নেই, ভারত সরকার বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে বি.টি. তুলো নামে একটি GMO চাষের ছাড়পত্র দিয়েছে এবং আরও বেশ কিছু GMO-র চাষ ছাড়পত্র পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার মত কয়েকটি দেশে যেমন বিভিন্ন GMO র অবাধ চাষ হচ্ছে, তেমনি সমগ্র ইউরোপ জুড়ে GMO র চাষ নিষিদ্ধ। যারা GMO চাষের পক্ষে তারা বলেন যে, বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য আবিস্কারটি মানুষের খাদ্য উৎপাদনে বিপ্লব আনতে পারে সেই তুলনায় ঝুঁকি যৎসামান্য। কেউ কেউ আরও একধাপ এগিয়ে বলেন যে ঝুঁকিটুকির কথা যা বলা হয় তা নিছকই তাত্ত্বিক, বাস্তবে এরকম ঝুঁকির সম্ভাবনা নেই। নানান ক্ষমতালিপ্ত গোষ্ঠী নানান কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য এই ঝুঁকির কথা বলে। আর কিছু অতি আদর্শবাদী সংগঠন এইসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে GMO বিরোধী আন্দোলন ক'রে কৃষির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। GMO চাষের বিরুদ্ধে যারা তাঁরা বলেন যে, এই চাষ মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এই GMO চাষের ফলে মানুষ তথা প্রকৃতির এমন ক্ষতি হতে পারে যা আক্ষরিক অর্থেই অপূরণীয়। GMO চাষের পক্ষে বিপক্ষে যুক্তির অভাব নেই। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই বিতর্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, ড. এম. এস. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল 'Serving Farms and Saving Farming' শীর্ষক একটি নিবন্ধে ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য GMO-র প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। উল্লেখ্য নিবন্ধটি ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রকের অধীনস্থ National Commission on Farming 2006 সালের 4ঠা অক্টোবর পেশ করেছিল এবং তাকে কার্যকর করা নিয়ে আজও বিতর্ক চলছে। GMO বিষয়টি নিঃসন্দেহে জটিল। এই বিতর্কে কোনো পক্ষাবলম্বন করতে হলে GMO ও পরিবেশের ভারসাম্য বিষয়ক কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য জেনে নেওয়া বিশেষ দরকার।

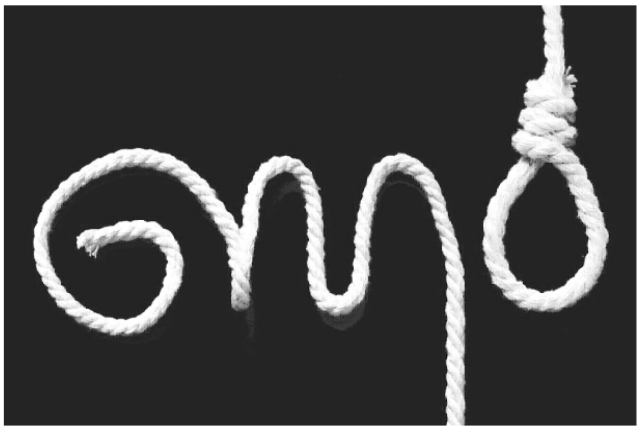

জিন পরিবর্তিত শস্য সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমে জিন সম্পর্কে কিছু কথা বলার দরকার। জিন বলতে সাধারণতঃ DNA বলে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থকে বোঝানো হয় যারা কোনো জীবের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করে। যেমন কোনো ফল কতটা মিষ্টি বা টক, কোনো গাছের কাঠ কতটা কঠিন বা নরম, কোনো ধানগাছের বন্যা সহ্য করার ক্ষমতা আছে কিনা, কুকুরের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা, জোনাকী পোকার আলো জ্বালাবার ক্ষমতা সবই জিন তথা DNA নিয়ন্ত্রণ করে। এই DNA থাকে প্রতিটি জীবের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে। যদিও বিজ্ঞানীদের অনেকে জীবের প্রতিটি বেশিষ্ট্যের উপর DNA-র নিয়ন্ত্রণের এই তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন তবুও আনবিক জীববিদ্যায় এই মতটিই প্রাধান্যে রয়েছে। যাই হোক DNA-ই যদি কোনো একটি জীবের কোনো একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করবে তাহলে একটা জীবের কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের নিয়ন্ত্রক জিন তুলে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কোনো জীবের দেহে ঢোকাতে পারলে প্রথম জীবটার বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় জীবে নিয়ে আসা যাবে। বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনায় সে প্রচেষ্টাও সফল হল এবং তার ফল হল চমকপ্রদ। আজ থেকে প্রায় 20-25 বছর আগে জোনাকী পোকার আলো জ্বালাবার জন্য দায়ী জিনটিকে তার দেহ কোষ থেকে বার করে তামাকগাছে ঢোকানো হয়, তার ফলে এমন তামাকগাছ তৈরী হয় যা জোনাকীর মত আলো বিকিরণ করতো। এরপর নানান জীবের নানান জিন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবে প্রতিস্থাপন করে অদ্ভুত তাকলাগানো সব ঘটনা ঘটালেন বিজ্ঞানীরা। যার সুফল নিঃসন্দেহে মানুষ ভোগ করেছে। যেমন মানুষের দেহে ইনসুলিন বলে একরকম হর্মোন আছে যার অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়। মানুষের এই ইনসুলিন তৈরীর জন্য দায়ী জিনটিকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে ঢুকিয়ে সেই ব্যাকটেরিয়াকে ল্যাবরেটারিতে বাড়িয়ে বিশুদ্ধ ইনসুলিন তৈরী করা গেছে যা ডায়াবেটিস চিকিৎসায় বিপ্লব নিয়ে এসেছে। এরকম আরোও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। জীন প্রতিস্থাপনের এই প্রযুক্তি বা জিনপ্রযুক্তি (সংক্ষেপে GE) কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, অচিরেই তা কৃষিতে বিস্তার লাভ করলো। ভারতে যে বি.টি. তুলো চাষ হচ্ছে তাতে ব্যাসিলাস থুরিনজিনেসিস (Bacillus thuringinesis) নামক এক ব্যাকটেরিয়ার জিন ঢোকানো আছে। প্রকৃতিতে এই ব্যাকটেরিয়া কিছু বিশেষ ধরনের পতঙ্গের দেহে রোগ সৃষ্টি করতে পারে ফলে পতঙ্গ মারা পড়ে। ওই ব্যাকটেরিয়ার দেহে এমন কিছু জিন আছে যারা বিশেষ ধরনের বিষাক্ত প্রোটিন তৈরী করে পতঙ্গের পৌষ্টিকনালীতে ক্ষত সৃষ্টি করে পতঙ্গের মৃত্যু ঘটায়। বি.টি. জিন তুলোগাছের দেহে ঢোকানো হলে তুলোগাছের কোষে কোষে ওই বিষাক্ত প্রোটিন তৈরী হবে। বর্তমানে তুলোগাছের সবচেয়ে প্রধান শত্রু হল বোলওয়ার্ম (Bollwarm) এই পোকা যদি Bt তুলোর কোনো অংশ খায় তাহলে ওই Bt বিষের প্রভাবে মারা পড়বে। ফলে Bt তুলোর চাষ

করলে বোলওর্য়ামের আক্রমণ হবে না এবং বোলওর্য়াম প্রতিরোধ করার জন্য কোনো কীটনাশকও লাগবে না। কিন্তু Bt বিষ কেবল বোলওর্য়াম বা তার নিকট সম্পর্কীয় কিছু পতঙ্গকেই (Lepidoptera গোত্রের) মারতে পারে, তুলোগাছের অন্যান্য শত্রু যারা, যেমন- সাদামাছি, জাবপোকা (Aphid) ইত্যাদি পোকার বিরুদ্ধে এই Bt বিষ কার্যকর নয়। ব্যাসিলাস থুরিনজিনেসিস ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত প্রোটিন উৎপাদক জিন অন্যান্য ফসলে প্রতিস্থাপিত করে আরও নানান রকম GMO তৈরী করা হচ্ছে যেমন Bt বেগুন, Bt ভুট্টা ইত্যাদি। এগুলি এখনও ভারতবর্ষে চাষের ছাড়পত্র পায়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের GMO চাষ হচ্ছে। সেগুলির সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। USA তে একধরনের জিন পরিবর্তিত টমাটো চাষ হয় যার নাম Flaver Saver Tomato। এটি পচন প্রতিরোধী অর্থাৎ সহজে পচে না, শক্তপোক্ত গড়ন সহজে থেঁতলে যায় না, তাই মেশিনের সাহায্যে সহজেই এই টমাটো তোলা যায়, তাতে টমাটো নষ্ট কম হয়। সহজে পচে না বলে সংরক্ষণ করাও সহজ। আর এক ধরনের জিন পরিবর্তিত শস্য হল Round up Ready সয়াবিন। এটিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক চাষ হয়। রাউন্ড আপ হল গ্লাইফোসেট নামক এক বিষাক্ত রাসায়নিকের বাজার চলতি নাম। এই রাউন্ড আপ আগাছা নাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই বিষ প্রয়োগ করলে সাধারণ সয়াবিন গাছও মরে যাবে। কিন্তু রাউন্ড আপ রেডি সয়াবিন এই বিষের প্রভাব মুক্ত। তাই রাউন্ড আপ রেডি সয়াবিনের ক্ষেতে যথেচ্ছ এই বিষ ব্যবহার করা হয়, তাতে জমির সমস্ত গাছ মরে যায় শুধু রাউন্ড আপ রেডি সয়াবিন বেঁচে থাকে। এই ধরনের রাউন্ড আপ রেডি ফসলের জমিতে আগাছা সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায়। গোল্ডেন রাইস হল আর এক রকমের জিন পরিবর্তিত ধান যার দানায় ভিটামিন A থাকে। ভিটামিন A র অভাবে অনেক শিশুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের মত গরীব দেশে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। অনেকে দাবী করেন গোল্ডেন রাইস চাষ করা হলে এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জিন পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও অনেক ফসল তৈরী করা হয়েছে যেমন লৌহ সমৃদ্ধ চাল, বিশেষ ধরনের রোগ প্রতিরোধী (Cucumber mosic virus) তামাক, ভাইরাস প্রতিরোধী স্কোয়াশ এরকম আরও কত কি।

এই সমস্ত জিন পরিবর্তিত শস্য কতটা প্রয়োজনীয় বা কতটা বিপজ্জনক সেই আলোচনায় যাবার আগে প্রকৃতির ভারসাম্য সংক্রান্ত কিছু কথা বলা জরুরী। প্রকৃতির ভারসাম্য বিষয়টা কতটা জটিল তা ইকোলজির নিবিড় অধ্যয়ন না করলে উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হলে তার ভয়াবহ প্রভাব কীভাবে মানুষের জীবনে নেমে আসে তাও বোঝা বেশ কঠিন। অনেক জীব যা আপাতভাবে মানুষের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর তারা অবলুপ্ত হয়ে গেলে মানবজীবনে অপ্রত্যাশিত সংকট ডেকে আনতে পারে। আবার কোনো আপাত নিরীহ এমনকি মনোরম নতুন ধরনের জীবকে কোনো বাস্তুতন্ত্রে এনে ফেলওে ভয়াবহ ফল হতে পারে। কচুরিপানার (Echhorniesp) নীলাভ বেগুনি ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে যিনি এই উদ্ভিদটিকে ভারতবর্ষে এনে ছিলেন তিনি বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে এটি কী মারাত্মক জলজ আগাছা হয়ে দেশের খালবিল, পুকুর, নদী ছেয়ে ফেলবে। বিগ্রেড মাছও (Hypophtholmichthys robilies) খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাই দ্রুত প্রাণীজ প্রোটিন উৎপাদনের আশায় যারা এই মাছ এদেশে এনেছিল তারা বুঝতেও পারেনি এই মাছ কোনো জলাশয়ে রাখলে অতি সুস্বাদু দেশী মাছ কাতলার (Cetla cetle) বাড় একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এর থেকে আরও অনেক চমকপ্রদ উদাহরণ দেওয়া যায়। জলহস্তি প্রাণীটি মানুষের কোনো উপকারে লাগে একথা হজম করা বেশ কঠিন। কঙ্গো অববাহিকায় যেখানে জলহস্তি দেখা যায় তার আশপাশের কিছু উপজাতিভুক্ত মানুষ জলহস্তির মাংস খায় এই পর্যন্ত। উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা কঙ্গো অববাহিকার জঙ্গলের দামি কাঠ ইউরোপে চালান দিতে শুরু করলো। তারা কঙ্গো নদী দিয়ে ওই কাঠ ভাসিয়ে সমুদ্র বন্দরে নিয়ে যেত। এই যাত্রাপথে প্রধান বাধা ছিল জলহস্তি। তারা মাঝে মাঝে নৌকা উল্টে দিত। জলহস্তি মারার জন্য ওই শ্বেতাঙ্গ কাঠ ব্যবসায়ীরা উপজাতীয় মানুষদের হাতে রাইফেল তুলে দিল। সেই ভীষণ মারনাস্ত্রের দাপটে অচিরেই নদী প্রায় জলহস্তি শূন্য হয়ে গেল। কিন্তু একটা জলহস্তি প্রতিদিন কয়েক টন জলজ আগাছা খায়। জলহস্তির অভাবে সেই আগাছা হু হু করে বাড়তে থাকলো এবং অল্পদিনের মধ্যেই নদী আগাছায় ঢেকে গিয়ে নৌ-চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেল। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। কঙ্গো নদীর এক ধরনের শামুক ওই আগাছা খেত। জলহস্তি আগাছার সিংহভাগ খেয়ে নিত বলে শামুকের ভাগে পড়তো খুবই কম, তাই শামুকের সংখ্যাও ছিল কম। কিন্তু জলহস্তি কমে যাওয়াতে শামুকের সংখ্যা প্রচন্ড বেড়ে গেল। এই শামুক আবার ছিল মানুষের এক মারাত্মক মারণ রোগ সিষ্টোসোমীয়ার বাহক। তাই সেই রোগের মড়কে কঙ্গো অববাহিকা জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তবে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' আফ্রিকাতেই নয়, সভ্যতাদর্পী আমেরিকাতেও প্রকৃতির খেলা একই রকম জটিল ও বহুব্যাপ্ত। এবারে গল্পের নায়ক নেকড়ে। আমেরিকার ইয়োলোষ্টোন ন্যাশনাল পার্কে 1993 সালে কিছু নেকড়ে ছাড়া হল। ওই অঞ্চলে নেকড়ে লুপ্ত হয়ে গেছিল। প্রায় 70 বছর পরে আবার নেকড়েদের ফিরিয়ে আনা হল। নেকড়েরা না থাকাতে হরিণের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। তারা ইয়োলোষ্টোন নদীর তীরে সমস্ত ঘাস ও সদ্যজাত উদ্ভিদ খেয়ে শেষ করে ফেলতো। নেকড়েরা আসাতে হরিণের সংখ্যা শুধু কমলই না, হরিণেদের আচরণেও পরিবর্তন এলো। তারা নদীর তীর পরিত্যাগ করে উচ্চভূমির জঙ্গলে চলে গেল। নদীর তীরে প্রচুর ঘাস জন্মালো। বড় বড় বৃক্ষের চারা জন্মাতে পারলো। নদীর তীরে ঘন জঙ্গল হল। বড় গুঁড়িওয়ালা গাছ জন্মানোর ফলে প্রচুর পাখি এলো, ঘাস জঙ্গল হওয়ার ফলে খরগোশ, ইঁদুররা এলো, তাদের খাদক হিসাবে শিয়াল এবং বাজপাখি আর ঈগলরাও এলো। গাছের মোটা কান্ড দাঁতে কেটে বীভাররা তাদের বাসা বানালো, তাদের বাসার নিচে আশ্রয় নিলো অনেক প্রজাতির উভচর আর সরীসৃপ।

নদীর পাড়ে জঙ্গল হওয়াতে ভূমিক্ষয় কমলো এবং প্রায় মজে যাওয়া ইয়োলোস্টোন নদী আবার স্রোতঃস্বিনী হয়ে উঠলো। নেকড়েরা আসার আগে মানুষ কিন্তু প্রায়ই উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হরিণ শিকার করতো কিন্তু তাতে গোটা অঞ্চলের সেই পরিবর্তন হয়নি যা শিকারি নেকড়েরা করতে পারলো।

উপরের দুটো উদাহরণ প্রকৃতির ভারসাম্যের জটিলতা বোঝানোর জন্য দেওয়া হল। একটা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির জীবের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, প্রকৃতির বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক উপাদানের সাথে তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অ্যাতো জটিল যে কোনো বাস্তুতন্ত্রে কোনো নতুন ধরণের জীব প্রবেশ করলে অথবা কোনো রাসায়নিক পদার্থ যথেচ্ছ প্রয়োগ করলে বাস্তুতন্ত্রের উপর তার তাৎক্ষণিক ও সুদূর প্রসারি ফল কী হবে সে সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা প্রায় অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আমরা কিছু GMO-র পরিবেশের তথা মানুষের উপর প্রভাব নিয়ে কিছু আলোচনা করবো।

ভারতে যেহেতু বি.টি. তুলোর চাষ হয় এবং আরও কয়েক রকম বি.টি. শস্যের চাষ ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায়, তাই প্রথমে বি.টি. ফসল নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ভারতে মনস্যান্টো নামে এক অতি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা বোলগার্ড নাম দিয়ে বি.টি. তুলোর বীজ বিক্রি শুরু করে। এই বীজের দাম সাধারণ তুলো বীজের তুলনায় ছিল খুবই চড়া। চাষীরা বেশী দামেও এই বীজ কিনেছিল কারণ মনস্যান্টো কোম্পানীর তরফে কৃষকদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে এই তুলো চাষে কীটনাশক খরচ হবে শূন্য। কিন্তু বাস্তবে বি.টি. তুলোর ক্ষেত পোকার আক্রমণে উজাড় হয়ে যায়। প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করেও বিশেষ লাভ হয় না। ভয়াবহ অর্থনৈতিক ক্ষতির ফলে অনেক কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি যে সমস্ত রাজ্যে বি.টি. তুলোর চাষ হয়েছিল সেইখানেই এই ঘটনা ঘটে। এই সমস্ত রাজ্যের কৃষিমন্ত্রক প্রকাশ্যে মনস্যান্টো কোম্পানীর বোলগার্ড তুলোর ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এইসব ঘটনা গত শতাব্দীর শেষ দিকে বা এই শতাব্দীর প্রথম দিকের। কেন এইসব ঘটনা ঘটেছিল তার সঠিক কারণ বলা কঠিন। বি.টি. বিষ বোল ওয়ার্ম মারতে পারে, কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের অনেক বি.টি. তুলোর ক্ষেতে বোল ওয়ার্মের সাংঘাতিক আক্রমণ হয়েছিল। কোথাও কোথাও বি.টি. বিষ যে সমস্ত পোকা মারতে পারে না তাদের আক্রমণ ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। অ্যাতো কিছুর পরেও বি.টি. তুলোর চাষ কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়নি। বর্তমানে ভারতের যেখানে যেখানে বি.টি. তুলোর চাষ হয় সেখানে যথেষ্ট কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। বি.টি. তুলোর চাষ যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সে কথা ড. স্বামীনাথন তার Serving Farmers and Saving Farming নিবন্ধে স্বীকার করেছেন। তিনি ক্ষুদ্রচাষীদের এই চাষ থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বি.টি. তুলো চাষের প্রসার চান। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে তিনি চান ধনী চাষীরা এই চাষ করুক। কিন্তু ধনী চাষীরাই বা এই চাষ করবে কেন? কারণ প্রচুর সার জল দিতে পারলে ঠিকঠাক সময়ে ঠিক ঠিক কীটনাশক স্প্রে করতে পারলে এই তুলোর ফলন বেশী। আর অনেক জায়গাতে সত্য সত্যই এই বি.টি. তুলো অন্তত বোল ওয়ার্মটা প্রতিরোধ করতে পারে। কখনও কোনো বাস্তুতান্ত্রিক বিপর্যয়ে যদি বি.টি. তুলো চাষ মার খায় তাহলে অন্তত ধনী চাষীরা তা সামলে নিতে পারবে। বি.টি. তুলোর ক্ষেতে কিন্তু এখনও মাঝে মাঝেই ভয়াবহ পোকার উপদ্রব ঘটে। যেমন কিছুদিন আগেই পাঞ্জাবে ঘটেছে। বি.টি. তুলোর চাষ যে বর্তমান ভারতে সাফল্য পেয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনতত্ত্বের অধ্যাপক ড. পেন্টাল একটি পরিসংখ্যান দেখিয়েছেন, 2002-03 সালে যেখানে 7.7 মিলিয়ন হেক্টর জমিতে 13.6 মিলিয়ন বেলতুলো উৎপাদন হতো এখন 10.8 মিলিয়ন হেক্টরে 33.4 মিলিয়ন বেলতুলো উৎপাদন হচ্ছে।

বি.টি. তুলোর চাষ যদি অবাধে চলতে থাকে তাহলে এই উৎপাদন বৃদ্ধি কতদিন স্থায়ী হবে মূল প্রশ্নটা সেখানে। সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে চাল গমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য পাঞ্জাবে ক্যানসারের মহামারি দেখা দিয়েছে। দেশের দুই তৃতীয়াংশ জমি বন্ধ্যা হতে চলেছে। রোগ পোকার উপদ্রব অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। এবার তেমন কিছু বা তার থেকেও ভয়াবহ কিছু হবে নাতো। আসুন দেখা যাক।

বি.টি. তুলো বা যে কোনো বি.টি. শস্য লেপিডোপটেরা গোত্রের পতঙ্গ মারতে পারে কারণ তার প্রতিটি দেহকোষে ওই ধরনের পতঙ্গ মারার বিষ তৈরী হয়। অর্থাৎ পোকা মারার বিষটা বাইরে থেকে না দিয়ে গাছের ভিতরেই তৈরী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, কোনো বিষ বারংবার প্রয়োগ করলে পতঙ্গ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। 1980 দশকের মাঝামাঝি সময়েই দেখা গিয়েছিল যে অন্তত 450 প্রজাতির পতঙ্গ এক বা একাধিক কীটনাশক বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। এই একই কথা বি.টি. বিষের ক্ষেত্রেও সত্যি। ড. বি. ই. টাবাশ নিকের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, বোলওয়ার্ম কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই বি.টি. বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছে। তিনি তার গবেষণাগারে এমন বোলওয়ার্ম তৈরী করতে সক্ষম হন যারা বি.টি. বিষের বিরুদ্ধে সাধারণ বোল ওয়ার্মের তুলনায় 240 থেকে 420 গুণ বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই গবেষণা থেকে অনুমান করা যায় যে, বি.টি. তুলো বা অন্যান্য বি.টি. শস্য আস্তে আস্তে বোল ওয়ার্মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। ফলে বি.টি. তুলো চাষে কীটনাশক কম লাগে এই দাবীর স্থায়ীত্ব কম। প্রকৃত তথ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু জায়গায় GMO চাষ করতে, সাধারণ শস্যের তুলনায় অনেক বেশী রাসায়নিক লাগে। 2001-02 সালেই সাধারণ শস্যের তুলনায় GMO চাষ করতে 73 মিলিয়ন পাউন্ড বেশী কেমিক্যাল স্প্রে করতে হয়েছিল।

যে কোনো বি.টি. ফসলের মূল থেকে বেরিয়ে আসে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যা মাটির বহু উপকারী অণুজীব মেরে ফেলে। এই উপকারি অনুজীবগুলি মাটির উর্বরতা ধরে রাখার জন্য অপরিহার্য। তাই বি.টি. শস্য চাষ করলে মাটির উর্বরতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে। বি.টি. ফসলের প্রতিটি কোষ বিষে ভরা, ফসলের প্রয়োজনীয় অংশটা নেবার পর বাকি গাছটা আর তার কোষে কোষে থাকা বিষের কী হবে? গাছের পচনের ফলে সেই বিষ তাদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে মিশে যাবে জলে স্থলে। বহুজীবের মৃত্যুর কারণ হবে এই বিষ, আর তার ফল কী হবে, কোনদিক থেকে মার নামবে তা কেউ জানে না, জানা সম্ভব নয়। যেমন কেউ কি ভাবতে পেরেছিল জলহস্তি মারলে কঙ্গো অববাহিকা জনশূন্য হয়ে যাবে? বিভীষিকার এ তো সবে শুরু। বি.টি. বিষ বহু উপকার পতঙ্গের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। প্রজাপতিরা মারা যায়, যারা না থাকলে পরাগ মিলন হবে না। বি.টি. ফসলের পরাগ অন্যান্য সমগোত্রীয় ফসলের গর্ভমুন্ডে পড়লে সংকরায়নের মাধ্যমে তাদের শরীরেও বি.টি. জিন চলে আসতে পারে। এই সম্ভাবনা একেবারেই তাত্ত্বিক নয়, জিন বদলানো ভুট্টার পরাগ 500 কিমি দূরের অন্য জাতের ভুট্টাকে সংক্রামিত করেছে এমন নজির আছে। যাই হোক Bt ফসলের পরাগ আগাছাদের অনেক উদ্ভিদ প্রজাতিকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে, তার ফল কী হবে কেউ জানে না, এক অনিশ্চিত ভয়াবহ ভবিষ্যৎ।

এবার সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। বি.টি. বিষ মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক। এই বিষ মানুষের শরীরে নানা রকম অ্যালার্জী এবং ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে, গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কোনো দেশে যদি বি.টি. শস্য ব্যাপক চাষ হয় তাহলে সে দেশের মানুষও এই বিষে আক্রান্ত হবে। কানাডায় এই বি.টি. ফসলের ব্যাপক চাষ হয়। সেখানে Sherbrooke বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি সমীক্ষায় দেখেছেন যে, 93 শতাংশ মা ও 80 শতাংশ ভ্রূণের রক্তে বি.টি. বিষ রয়েছে। আমরা কি তুলোর ফলন বাড়াবার জন্য এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ মেনে নেবো, চাষীদের আরও নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেবো, নাকি বিকল্প খুঁজবো?

কোনো দেশে যদি বি.টি. শস্য ব্যাপক চাষ হয় তাহলে সে দেশের মানুষও এই বিষে আক্রান্ত হবে। কানাডায় এই বি.টি. ফসলের ব্যাপক চাষ হয়। সেখানে Sherbrooke বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি সমীক্ষায় দেখেছেন যে, 93 শতাংশ মা ও 80 শতাংশ ভ্রূণের রক্তে বি.টি. বিষ রয়েছে। আমরা কি তুলোর ফলন বাড়াবার জন্য এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ মেনে নেবো, চাষীদের আরও নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেবো, নাকি বিকল্প খুঁজবো?

যে GMO গুলি ভারতে চাষ হয় না তাদের সম্পর্কেও কিছু আলোচনা দরকার, কারণ সেগুলিও ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে রাউন্ডআপ রেডি সয়াবিনের কথা। এই সয়াবিনের গ্লাইফোসেট নামক আগাছা সহনশীল জিন ইতর পরাগ যোগের মাধ্যমে অন্যান্য প্রজাতির উদ্ভিদে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার ফলে এমন আগাছা সৃষ্টি হতে পারে যা গ্লাইফোসেটে মরবে না, এরফলে রাউন্ড আপ রেডি ফসলের ক্ষেতেও ওই আগাছা জন্মাবে, হাজার গ্লাইফোসেট প্রয়োগ করেও তাদের মারা যাবে না। তাই রাউন্ড আপ রেডি ফসল তৈরীর মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বেশী সময় লাগবে না। এই আশঙ্কাও কিন্তু নিছক তাত্ত্বিক নয়। আমেরিকাতে এক ধরনের রাউন্ড আপ রেডি ফসল থেকে 14 কিমি দূরের আগাছায় রাউন্ড আপ সহনশীল জিন ঢুকে পড়তে দেখা গেছে। এইভাবে বি.টি. বিষ সহনশীল পোকা বা গ্লাইফোসেট সহনশীল আগাছা যা সৃষ্টি হবে তা ভবিষ্যতের কৃষিতে ভয়ানক বিপর্যয় ডেকে আনবে। বি.টি. শস্যের অবাধ চাষের ফলে যে পতঙ্গটি বি.টি. বিষ সহনশীল হলো সেই প্রজাতি যদি ইতিমধ্যেই রাসায়নিক বিষ সহনশীল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে ঠেকানো হবে কী দিয়ে? সে হয়ে উঠবে Super Pest! এইসব GMO পরিবেশ কী ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তার আর একটি মারাত্মক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সম্প্রতি রাউন্ড আপ রেডি সয়াবিনের জমিতে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ইলেকট্রন আণুবিক্ষনিক জীবাণুর সন্ধান মিলেছে যার কথা বিজ্ঞানীরা আগে জানতেন না। এটি মানুষ, পশু ও উদ্ভিদের দেহে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। ঘটনার গুরুত্ব উল্লেখ করে Pardue বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডন হুবার জরুরীভিত্তিতে মার্কিন কৃষি সচিব টম ডিমল্যাককে রাউন্ড আপ রেডি সয়াবিন চাষ বন্ধ করার আর্জি জানিয়ে ছিলেন। আমাদের চোখের আড়ালে কোন GMO-র ক্ষেতে কী ভয়ংকর সর্বনাশ মাথা তুলছে, কে তার খবর রাখে।

এইসব রোগ খাড়া করে দেওয়া ঘটনার মাঝে কমিক রিলিফের মত আছে "গোল্ডেন রাইস" আর আয়রন সমৃদ্ধ চালের গপ্পো। GE-র মাধ্যমে এমন এক ধরনের ধান বানানো সম্ভব হয়েছিল যার চালে বিটা ক্যারটিন বলে এক ধরনের পদার্থ থাকবে। এই বিটা ক্যারটিন থেকেই মানবদেহে ভিটামিন A তৈরী হয়। এই ধানের নাম দেওয়া হল গোল্ডেন রাইস। এই ধান তৈরীর সাথে সাথে তাকে বাজারে বেচার জন্য বলা হল মানুষের ভিটামিন A-র অভাবজনিত অপুষ্টি তাড়াবার জন্য এ এক অভিনব উদ্যোগ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে সময় গোল্ডেন রাইসে এত সামান্য পরিমাণ বিটা ক্যারটিন থাকতো যে শুধু গোল্ডেন রাইস দিয়ে মানুষের প্রাত্যাহিক ভিটামিন A-র চাহিদা মেটাতে হলে রোজ 9 কেজি ভাত খাবার দরকার হত। যাই হোক প্রচুর টাকা খরচ করে অনেক গবেষণা করে এমন গোল্ডেন রাইস বানানো গেল যাতে বিটা ক্যারটিনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী। কিন্তু প্রশ্ন হল যখন বাধাকপি, কলমিশাক, কুমড়ো ইত্যাদি অত্যন্ত সস্তার সব্জি থেকেই প্রচুর বিটা ক্যারটিন পাওয়া যায়, তখন গোল্ডেন রাইসের দরকারটা কী? গরীব শিশুরা ভিটামিন A-র অভাবে অন্ধ হয়ে যায় তার কারণ এই নয় যে তাদের খাদ্যে বিটা ক্যারটিন থাকে না। আসল কারণ হল তাদের খাদ্যে তেল জাতীয় কোনো কিছু যথেষ্ট থাকে না, তাই বিটা ক্যারটিন শরীরে শোষিত হতে পারে না। গরীবদের খাবারে তেল থাকে না কেন? কারণ তেলের দাম বেশী। কেন তেলের দাম বেশী এদেশে কি তেল উৎপাদন করা যায় না? তা নয়, সবুজ বিপ্লবের সময় খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য তৈলবীজ চাষের জামির ব্যাপক কাটছাট করা হয়েছিল।

ভারতে অনেক মানুষ মূলতঃ মেয়েরা লোহার অভাবজনিত রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তার সমাধান হিসেবে হাজির করা হয়েছে আয়রন সমৃদ্ধ ধান। কিন্তু তার চিকিৎসা অত্যন্ত সস্তার ফেরাস সালফেট ট্যাবলেট দিয়ে করা যায়। দেশের অধিকাংশ লোক পরিসৃত পানীয় জল পায় না, তাই আমাশা রোগে ভোগে। এই রোগে ভুগলে অন্ত্র থেকে লোহা ঠিকমতো

শোষিত হতে পারে না, রক্তস্বল্পতার এটাও একটা বড় কারণ।

দেশের সরকারের ভুল পরিকল্পনায় তেলের দাম আকাশ ছোঁয়া। খাবারে তেল নেই বলে মানুষ ভিটামিন A-র অভাবে ভুগছে। জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পরিস্রুত পানীয় জল যারা মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে না তারা এখন সমাধান বাতলাচ্ছেন GE-র মাধ্যমে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ড. দেবল দেব এগুলিকে বলতেন বিজ্ঞানের বেশ্যাবৃত্তি।

বহু বিজ্ঞানীর বহু গবেষণা ও আবেদন সত্বেও GMO চাষ কিন্তু বন্ধ হবে না। কারণ GMO তৈরী করতে অকল্পনীয় খরচ, আর সে খরচ যোগায় MNC গুলো। তাই GMO কে তাড়াতাড়ি বাজারে বিক্রি করে মুনাফা না করতে পারলে চলবে কেন? মানুষের অসুখ হবে সে তো আরও ভালো কথা, ওষুধ বিক্রি করে মুনাফা করা যাবে। তাই MNC-র ভাড়াটে বিজ্ঞানী তোতাপাখির মত GMO-র সপক্ষে যুক্তি শুনিয়ে যাবে। যে বিজ্ঞানীরা GMO-র বিরোধীতা করবে তাদের কেরিয়ার খতম করে MNC-র বিরুদ্ধে ট্যাঁ ফোঁ করার সাজা টের পাইয়ে দেওয়া হবে। GMO-র বিরোধীতা করতে গিয়ে নিগৃহীত বিজ্ঞানীর সংখ্যা নেহাত কম নয়, ড. আর.ডি পুশকাই, রোজি মার্শেল ইত্যাদি অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে সেই তালিকায়। দেশের সরকার GMO চাষের ছাড়পত্র দেবে। চাষী মরবে, আমি আপনি মরব। কিন্তু পৃথিবী ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকলেও কি MNC থামবে না? তাদের CEO রাও তো মানুষ, তাদেরও তো ছেলেপিলে আছে। এবার মার্কসের ক্যাপিটাল থেকে একটা কোটেশন দিই—

"পুরাকালে যেমন বলা হত, প্রকৃতি শূন্যস্থান সহ্য করতে পারে না। তেমনি পুঁজি ও মুনাফা ছাড়া থাকতে পারে না। শতকরা 10 ভাগ মুনাফার জন্য যে কোনো জায়গায় লগ্নি হতে রাজি। 20% মুনাফা থাকলে বেশ হ্যাংলামো দেখা দেবে। 50% মুনাফা থাকলে রীতিমত জবরদস্তি গা-জোয়ারী শুরু করবে। 100% মুনাফা থাকলে সমস্ত ন্যায়নীতি দুপায়ে দলে যাবে। আর যদি 300% মুনাফার সম্ভাবনা থাকে তাহলে হেন পাপ কাজ নেই যা সে করতে পিছপা হবে, হেন ঝুঁকি নেই যা সে নিতে চাইবে না, এমনকি যদি পুঁজি মালিকের ফাঁসি যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলেও সে নিরস্ত হবে না।"

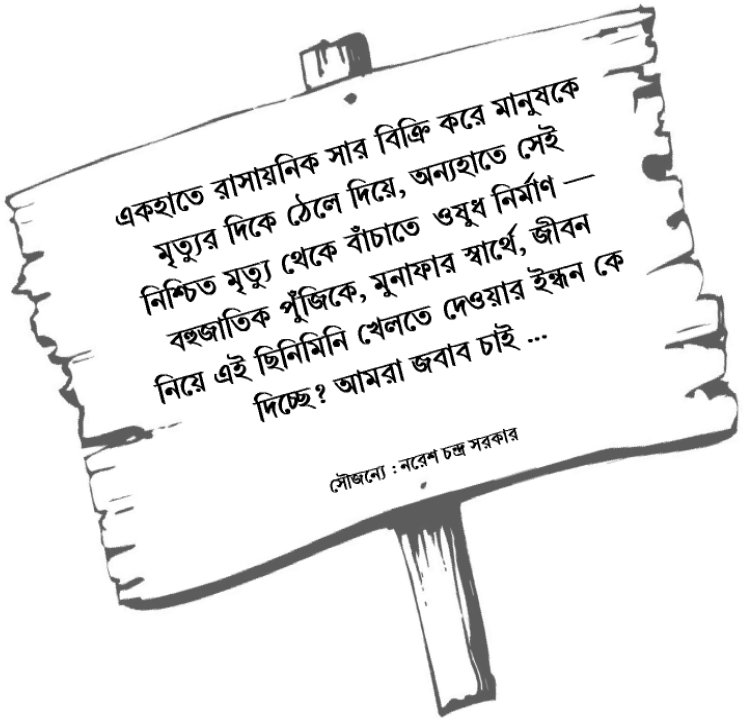

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষে খারিজ করার ১০ কারণ

আপনাদের কি মনে আছে যে ২০১০ সালে বিটি বেগুনের মতো GMO (জিন পরিবর্তিত শস্য) আমাদের খাবারে ঢোকেনি বা আমাদের ক্ষেতেও পৌঁছতে পারেনি। বিটি বেগুনের মতো GMO একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, অনাবশ্যক এবং সুরক্ষাবর্জিত। এমনটা ঘটেছিল, কারণ তখন ভারত সরকার বিটি বেগুনের পরিবেশ-মুক্তির বিষয়ে অনির্দিষ্টকালীন নিষেধাদেশ জারি করেছিল। এই বাণিজ্যিক চাষের বিষয়ে সরকার এই সিদ্ধান্ত বেয় বহু কিছু বিচার করেই। পাঁচ বছর পর এখন আবার একটি GM খাদ্যশস্যের বাণিজ্যিক চাষের সম্মতির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের GM সরষে (GM সরষে হাইব্রিড DHM 11) কেন খারিজ করা উচিত তার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে পর পর তুলে ধরছি।

১। **জিন পরিবর্তনের কারিগরি একেবারেই নিরাপদ নয় ঃ** জিন কারিগরি হল প্রাণী জগতের সঙ্গে যুক্ত উদ্ভিদ প্রজনন কারিগরি যা অস্বাভাবিক ও অনাষ্য, অপরিবর্তনীয় এবং নিয়ন্ত্রণ রহিত যা আমাদের খাদ্য ও চাষ ব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্বভাবতই এর প্রভাব পড়বে আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর। চাষে ঝুঁকি, চাষি ও উপভোক্তার বেছে নেওয়ার ক্ষমতালোপ এবং বাজার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা— এই সবই হল GMO পরিবেশ - মুক্তির ফল। GM শস্য ও খাদ্যের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন htpp://indiagminfo.org/?p=657

২। **জি এম সরষে একটি ট্রয়ের ঘোড়া ঃ** এই সরষেকে দেখানো হচ্ছে সরকারি ক্ষেত্রে GMO হিসেবে। ভাবখানা এমন যেন জৈব সুরক্ষার দিক থেকে দেখলে সরকারি GMO স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেসরকারি GMO - র চেয়ে বেশি নিরাপদ। সরকারি GMO বেসরকারি GMO - র মতো সমান বিপজ্জনক। আমাদের খাদ্য ও চাষে GMO নিয়ে ব্যাপক জনরোষের কারণেই মনসান্টোর মতো কোম্পানী নিয়ন্ত্রকের বিবেচনা তালিকায় থাকা জি এম ভুট্টা বিষয়ক আবেদন নিয়ে এখনকার মতো চুপচাপ আছে। যাতে সরকারি ক্ষেত্রের সুড়সুড়ি সমন্বিত জি এম সরষে আগেই অনুমোদন পায় এবং ফলত বিবেচনা তালিকায় থাকা GMO - র অন্তর্ভুক্তি সুবিধা হবে। এই জি এম সরষে হল সেই 'ট্রয়ের ঘোড়া'।

৩। **এই সরষে বেয়ারের জি এম সরষের মতোই ঃ** বেয়ারের সরষে ভারতীয় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে বাতিল করেছিল। ২০০২ সালে বার নসে ও বারস্টার জিন সমন্বিত হাইব্রিড GM সরষে সম্পর্কে আবেদন ভারতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাতিল করেছিল। বেয়ারের একটি উপসংস্থা প্রো-অ্যাগ্রোর বাণিজ্যিক চাষের অনুমতি বিভিন্ন কারণে বাতিল হয়। ICAR জানিয়েছিল যে GMO সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং এর ফলাফল বিষয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়। এছাড়াও বলা হয়েছিল, সবজি হিসেবে সরষের (সরষে খালি তৈলবীজ নয়— এর পাতা আর বীজ মানুষ সরাসরি খায়) কোনও পরীক্ষা এই ফলাফলে নেই। এছাড়াও নিয়ন্ত্রকরা যে সমস্ত জায়গায় প্রয়োজন নেই, সেখানে এই সরষের বিস্তার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তার সদুত্তর খুঁজে পাননি। সবচেয়ে জরুরি হল এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে প্রো-অ্যাগ্রোর সরষেটি হার্বিসাইড সহনশীল। যদিও শস্য-উদ্যোক্তার বক্তব্য হল, হার্বিসাইড সহনশীলতা একটি মার্কার কারিগরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জি এম সরষে বাণিজ্যিকরণের প্রাথমিক কারণ এটা নয়। নিয়ন্ত্রকরা ঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, GMO'র বেআইনি হার্বিসাইড ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা থেকেই যাবে এবং তা ঠেকানো অসম্ভব কাজ। এই সমস্ত কারণ দিল্লি বিশ্ব বিদ্যালয়ের জি এম সরষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৪। **সরষে ফলনে প্রথম সারির রাজ্যগুলি সহ অনেক রাজ্য সরকারই এই সরষের ফিল্ড ট্রায়ালেরও বিরোধী ঃ** রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানার মতো বিপুল সরষে উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি এই সরষের মাঠ পরীক্ষা করতে চায় না। সংবিধানমতে কৃষি ভারতে রাজ্যের বিষয়— GMO বিষয়ক অনুমোদনে যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিটি বেগুনের নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি মূল বিবেচ্য বিষয়গুলির একটি ছিল।

৫। **ভারত সরষে-বৈচিত্র্যের পীঠভূমি :** বেগুনের ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনই সরষে ক্ষেত্রেও, ভারত বৈচিত্র্যময়। এমন বৈজ্ঞানিকও আছেন যাঁরা বলেন ভারত সরষের উৎস। যে সমস্ত শস্যে আমাদের দেশ উৎস বা বৈচিত্র্যের আধার সেই সেই ক্ষেত্রে বিষয়টিকে হালকা করে দেখার বিরুদ্ধে যথার্থ সুপারিশ রয়েছে।

৬। **জি এম শস্যের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব, দূষণ অবশ্যম্ভাবী ঃ** এর পৃথিবীময় বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। জি এম সরষে উদ্ভাবক নিজেও একই কথা বলেছেন। এই সরষে চাষে সম্মতির ফল হল জৈবিক এবং দৈহিক দূষণ। এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে জৈব চাষি এবং তাঁদের স্বীকৃতির ওপর। এছাড়া আগাছা বাড়বে। নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এমন আগাছার উদয় হবে। ২০০৭ সালে GMO বিষয়ক এক জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একটি আদেশ জারি করে এই মর্মে বলে, সরকারকে দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। **দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরষে হার্বিসাইড সহনশীল কিন্তু দেখানো হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীল জিএম হাইব্রিড হিসেবে ঃ** এই সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া হচ্ছে যে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষের ভেতর হার্বিসাইড সহনশীল জিন রয়েছে। নিয়ন্ত্রকরা এ ঘটনা উপেক্ষা করতে পারেন না। বাস্তবিক পক্ষে হার্বিসাইড সহনকারী শস্য হিসেবে চাষিদের এই শস্য ব্যবহার এবং জিএম সরষের উপর বেআইনীভাবে হার্বিসাইড ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার কোনও উপায় নেই। ভারতের অনেক খ্যাত সংস্থাই হার্বিসাইড সহনশীল জিএম সরষের চাষ শুরু করার বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছে। কারণ এর স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত প্রভাব ছাড়াও আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। এর ফলে কৃষিমজুর, বিশেষত মহিলারা যারা ক্ষেত থেকে

আগাছা তুলে কিছু আয় করতেন তারা বঞ্চিত হবেন। এই সব কারণে ভারতীয় কৃষিতে HT (Herbiside Tolerant) জিএম সরষের কোনও জায়গা নেই।

৮। **জিএম শস্য তৈরির যেসব জিন ব্যবহার করা হয়েছে তার ফলে একে বলা হবে গার্ট (Genetic Use Restriction Technology) ঃ** জিন কারিগরির মাধ্যমে পুং প্রজনন ক্ষমতা করার উদ্দেশ্য একটি বারনাসে জিন জিএমও সরষেতে হাইব্রিডের পেরেন্ট্যাল লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বাণিজ্যিক চাষের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ভারতের PPVFR (Protection of Plan Varieties & Farmers Rights act) আইন GURT-কে মেন কারিগরি হিসেবে বর্ণনা করে যা মানুষ, পশুপাখি ও গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

৯। **আয়ুর্বেদে সরষের ব্যবহার ঃ** খাদ্য এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধে সরষে ব্যবহৃত হয়। বীজ ও তেল দুই হিসেবেই সরষের আলাদা আলাদাভাবে নানা ব্যবহারের নিদান আয়ুর্বেদে আছে। এ ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে জিএম সরষের প্রতিফল কী হবে তা একেবারেই পরিস্কার নয়। এ বিষয়ে খুব একটা পর্যালোচনাও হয়নি।

১০। **মৌমাছি ও মৌপালনে ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ** জিএম সরষে মৌমাছির উপর ব্যাপক বিরুপ প্রভাব ফেলবে। বিভিন্ন সমীক্ষা (জিএম বীজ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরা আদৌ কিছু করছেন কি?) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এর ফলে ফলনের ক্ষতি হবে - ক্ষতি হবে মধু উৎপাদনেরও। মৌপালন ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং ভারতীয় মৌ-পালকরা সরষের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সরষের চাষের সঙ্গে মৌপালনে সরষের উৎপাদন প্রায় ২০-২৫% বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তা মধু উৎপাদনেও সাহায্য করে যা মৌ-পালকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দেয়। নিকট অতীতে যেখানে জিএম ক্যানোলা চাষের এলাকা রয়েছে সেখানে ভারত জিএম সরষের বাণিজ্যিকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর হার্বিসাইডের প্রভাবের চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য পাওয়া গেছে খাদ্য ও পরিবেশের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে। এছাড়া নিয়ন্ত্রকদের ওপর সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও, এই সরষে বিষয়ক জৈব সুরক্ষা তথ্য কোনও গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। অতীতে সরকারি ক্ষেত্রের জিনেরও পরীক্ষানিরীক্ষা বিষয়ে নিয়ন্ত্রকরা ছাড় দিয়েছিল। তারপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রকদের ক্ষেত্রে নতুন এমন কিছু ঘটেনি, যাতে তাদের উপর আস্থা বাড়ে। এ ধরনের অনিরাপদ ও বিপজ্জনক কারিগরি থেকে আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে এদের উপর ভরসা রাখার মতো কোনও অতিরিক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

জিএম সরষে আমরা চাইনা, আমরা চাই জিএমও থেকে বিপদমুক্ত খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ।

কৃষি ও উপভোক্তা বিষয়টি যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারে তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষে বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট www.indiagmin.org

কোয়ালিশন ফর এ জিএম ফ্রি ইন্ডিয়া ও জিএম ফ্রি ওয়েস্ট বেঙ্গল এই দুই সমিতির পক্ষে জনস্বার্থে প্রচারিত।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

১. বিপদসীমার উর্দ্ধে বইছে স্বাস্থ্য—সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায় ও রূপক কুমার পাল

২. উইনস্প্রেড কনসেনসাস স্টেটমেন্ট

অনুবাদ ও সম্পাদনা : প্রবীর কুমার মন্ডল ও সুদেব সাহা

৩. মাদার আর্থ ল—শুভম ভট্টাচার্য

পরিবেশনায় : .**FIAM**, রায়গঞ্জ এ.পি.ডি.আর ও নাটমন্দির

প্রাণঘাতী প্লাস্টিক

প্রবীর কুমার মন্ডল

প্রতিদিন ঘুম ভেঙে আমি যে ব্রাশ ব্যবহার করি, যে বোতলের জল খাই, যে ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাই, যে দুধের প্যাকেট, মুদিখানায় জিনিস এমনকি যার মধ্যে মাছ নিয়ে ফিরি, যে বালতিতে স্নান করি, যে পাইপ দিয়ে স্নানের জল, রান্নার জল, অন্যান্য কাজের জল আসে, মাটির তলা থেকে যে পাইপ দিয়ে জল ওঠে, যে রিজার্ভয়রে জল জমা হয়, যে টেবিলে ও চেয়ারে খেতে বসি, যে টিফিন বাক্সে রুটি-সব্জি নিয়ে যাই অথবা যেদিন নিয়ে না যাই, সে দিন ক্যান্টিন থেকে যে প্লেটে রুটি-সব্জি দেয়, তারপর ধরা যাক বাড়ির জন্য যে ক্যারি ব্যাগে রসগোল্লা থেকে মোমো ভায়া ফুচকা পর্যন্ত নিয়ে ফিরি, আবার কখনও কখনও চিলি-চিকেন, বিরিয়ানি বা মাংস কসা যে সুসজ্জিত বাক্সে নিয়ে বাড়ি ফিরি, বা যে চামচে তুলে রসিয়ে কষিয়ে খাই, পুজো-পার্বনের দিনে শটকার্টে খিঁচুড়ি-লাবড়া যে ক্যারি ব্যাগে বিতরণ করি, মাসের বাজারের বিভিন্ন আইটেম যে প্যাকেটে বাড়িতে নিয়ে আসি, এমনকি চাল, ডাল, মুড়ি, চিনি, লবণ, তেল থেকে বিভিন্ন মশলাপাতি যে সব কৌটতে থাকে, সবশেষে রাতে খাবার পর শোবার আগে যে খাপে ওষুধ ঢেলে খাই, কয়েক ঢোক জল খাবার পর যে বোতলটা মাথার কাছে নিয়ে ঘুমোই সেই সব কিছুই প্লাস্টিকে তৈরী। কিন্তু আমাদের প্রাত্যাহিক জীবন জুড়ে এই যে প্লাস্টিকময়তা তাতে কোন ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে না তো আমাদের শরীরের ওপর? উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা পেয়েছি বেশ কিছু গবেষণার ফল। যা শুধু আমাদের চমকেই দেয় নি, যা পড়ে আমরা আতঙ্কিত! সেই সব গবেষণার কথা... আতঙ্কের কথাই আপনাদের সামনে ভাগাভাগি করে নিতে এই লেখা।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জিনতত্ত্ববিদ প্যাট্রিসিয়া হান্ট ক্রোমোজমের অস্বাভাবিকতা এবং ডিম্বাশয়ে ডিম্বানু উৎপাদনের মধ্যে ইঁদুরের ওপর গবেষণা শুরু করেন। আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করেন গবেষণাগারে সমস্ত ধরণের দূষণ মুক্ত পরিবেশে রাখা ইঁদুরদের মধ্যে নানা জন্মগত ত্রুটি ঘটছে এবং প্রায় ৪০ শতাংশ ইঁদুর গর্ভপাতের মত সাংঘাতিক সমস্যায় আক্রান্ত। কিন্তু এত গুরুত্বসহকারে দূষণ মুক্ত পরিবেশে রাখা সত্ত্বেও ইঁদুরদের মধ্যে কীভাবে এ ধরণের সাংঘাতিক সমস্যা দেখা দিল?

গলদ ধরা পড়ল গবেষণাগারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ব্যাক্তির সরঞ্জাম পরিস্কারের পদ্ধতিতে। ইঁদুরের খাঁচা ও খাবারের পাত্র পরিস্কারের জন্য যে উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছিল তা এতটাই শক্তিশালী যে পাত্র ও খাঁচার পলিকার্বনেট প্লাস্টিকের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে প্লাস্টিকের মধ্যের উপাদান বিসফেনল-এ (BPA) ধীরে ধীরে বেরিয়ে খাবারে মিশছিলো। উচ্চমাত্রায় বি. পি. এ. মিশ্রিত ওই খাবার ইঁদুরের শরীরে ঢোকাতেই যত বিপত্তি। ইস্ট্রোজেনধর্মী ওই রাসায়নিকের প্রমাণ মেলে ইঁদুরের মূত্রে।

এই ঘটনায় সমূহ বিপদের আশঙ্কা অনুভব করে ডঃ হান্ট গবেষণার ফলাফল সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন। যা বিশ্ব জুড়ে অনিয়ন্ত্রিত প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের বাড়বাড়ন্তকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। মানবদেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে শুরু হল বিতর্ক।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিশ্ববাণিজ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে প্লাস্টিক। আর সেই প্লাস্টিক অর্থাৎ পলিকার্বনেট তৈরীতে বা তার চাইতে আরো শক্তিশালী উপাদান তৈরীতে বি. পি. এ.-র ব্যবহার এখন সর্বজনবিদিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ থেকে বিজ্ঞানী তথা পুঁজি বিনিয়োগকারী সকলের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন, বি. পি. এ. নামের ওই রাসায়নিক পদার্থটি মানবদেহের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর? যদি ক্ষতিকর হয় তবে কি চিকিৎসায় তার নিরাময় সম্ভব? আমাদের শরীরের ক্রোমজোমে এর কি কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে বেড়াতে হবে?

বর্তমানে সারা বিশ্বজুড়েই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় ইঁদুরের শরীরে অসংখ্য ক্ষতিকারক প্রভাব তৈরীর পেছনে বি. পি. এ.-র যোগসূত্র পেয়েছেন। তাছাড়া স্তন এবং প্রস্টেট ক্যানসার, পুরুষদের প্রজনন সংক্রান্ত ত্রুটি, মেয়েদের অকাল বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তি, এমনকি কিছু গবেষণায় হাঁপানি, স্থূলত্ব, আচরণগত সমস্যা, যেমন মনসংযোগে ঘাটতির মত সমস্যার জন্যও বি. পি. এ.-কে দায়ী করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, ইঁদুরের ক্ষেত্রে যে যে বিপত্তি ঘটছে... মানুষের ক্ষেত্রেও কি তা ঘটতে পারে? আরো একটি উল্লেখ করার মত বিষয় হল, যে রাসায়নিকটি হরমোনের মত আচরণ করার ফলে বিভিন্ন বিপত্তি ঘটছে... সেইসব মারাত্মক সমস্যাকে চিহ্নিত না করে কেন প্লাস্টিক শিল্পে গবেষণা ও বিপণনের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে?

এবার আসা যাক বিসফেনল-এ বা বি. পি. এ. রাসায়নিকটি কী সে প্রসঙ্গে। কার্বনঘটিত এই কৃত্রিম যৌগটিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রুশ বিজ্ঞানী দিয়ানিন প্রথম সর্বসমক্ষে নিয়ে আসেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বি. পি. এ. আমাদের জীবনযাত্রায় সেভাবে ব্যাপকমাত্রায় ঢুকতে পারেনি। সাধারণত পলিকার্বনেট প্লাস্টিক ভঙ্গুর প্রকৃতির হয়। বি. পি. এ. ও ফসজিন এর সাথে মেশানোর পরই প্লাস্টিকের ভঙ্গুরতা আটকানো যায় এবং এর পাশাপাশি কাঁচের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। গাড়ির হেডলাইট, লেন্স, ছোট বোতল, খাবার রাখার পাত্র, জলের বোতল, ডি. ভি. ডি. এ ভাবেই তৈরী হয়। এছাড়া এপক্সি রেজিন, জলের পাইপ তৈরীতে, দাঁতের চিকিৎসায়, খাবার ও পাণীয়'র পাত্রের ভেতরের আস্তরণে, থার্মাল পেপার তৈরীতে (যা দিয়ে রসিদ তৈরী হয়), এবং খাবারের মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত পেপার তৈরীতেও বি. পি. এ. ব্যবহৃত হয়। মুখ্য একক হিসেবে

প্লাস্টিক শিল্পে বি. পি. এ.-র ব্যবহার গত ৩০ বছরে এক লাফে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং বর্তমানে এর বাৎসরিক ব্যবহারের পরিমাণ ৩.৬ লক্ষ টনের কাছাকাছি।

এতক্ষণে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে মূলত খাদ্যগ্রহণের মধ্যে দিয়েই বি. পি. এ. আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। যদিও ত্বকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশের সম্ভাব্য প্রমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিমার ইঞ্জিনিয়ারদের মতে রাসায়নিক দিক দিয়ে বি.পি.এ.'র সবটুকুই প্লাস্টিকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যখন প্লাস্টিককে উত্তপ্ত বা প্রচন্ড ঠান্ডা অবস্থায় রাখা হয় বা ক্ষয়ধর্মী রাসায়নিক (ডা. হান্টের পরীক্ষায় যেমনটা হয়েছিল) বা অ্যাসিড জাতীয় পদার্থের সংস্পর্শে প্লাস্টিক পাত্র থাকে তখন বি.পি.এ. প্লাস্টিক থেকে মুক্ত হয়ে পাত্রস্থ উপাদানে মিশতে থাকে। সাধারণত প্লাস্টিকের পাত্র এবং বোতল মাইক্রোওভেনে গরম করলে বা অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে এলে বা গরম জলে বা অথবা অতি ক্ষারকযুক্ত ডিটারজেন্টে পরিষ্কার করলে এই ধরণের ঘটনা ঘটে। আমাদের দুশ্চিন্তার বিষয় হল অনেক ক্ষেত্রেই পাত্রের মধ্যে রাখা খাবার, জল, দুধ ফলের রসের মধ্যে মিশে যাওয়া বি. পি. এ আমাদের শরীরে ঢুকছে। পাত্রের খাবারে বি.পি.এ'র ঘনত্ব ৩৮০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজিতে। কিন্তু পাত্রস্থ পানীয়তে ৪.৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি কেজিতে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কেনাকাটির রসিদ বিজ্ঞাপণের লিফলেট, বিমান ও সিনেমার টিকিট যে থার্মাল পেপারে তৈরী হয় তাতেও বি.পি.এ ব্যবহার করা হয়। এটা লক্ষ্য করা গেছে এই ধরণের কাগজে থাকা বি.পি.এ আমাদের আঙুলে উঠে আসে (বিশেষত ভেজা ও তৈলাক্ত অবস্থায়), যা দু'ঘন্টারও বেশি সময় সক্রিয় থাকে। নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়েও বি.পি.এ'র শরীরের ভেতরে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

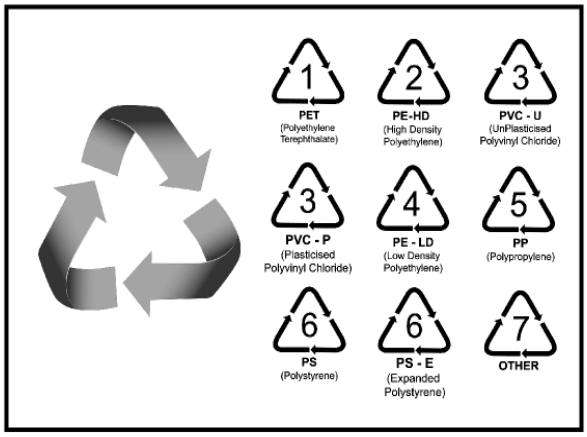

এবার বি.পি.এ আমাদের শরীরে কীভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটায় সেদিকে নজর দেওয়া যাক। গঠনগতভাবে বি.পি.এ এন্ডোক্রিন প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত হরমোন আমাদের শরীরে স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম ইস্ট্রোজেনের মত। ইস্ট্রোজেন আমাদের শরীরের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যেমন- প্রজনন, অস্থিবিকাশ, হৃৎপিন্ডের কর্মকান্ড কিডনি, প্রস্টেট গ্রন্থির পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিরিক্ত মাত্রায় ইস্ট্রোজেন ধর্মী কৃত্রিম যৌগ, এন্ডোক্রিন গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

পূর্বের কিছু গবেষণার ভিত্তিতে মনে করা হত বি.পি.এ'র গঠন যেহেতু ইস্ট্রোজেনের মত সেকারণে শরীরের যেখানে ইস্ট্রোজেন মানানসই সেই সব অংশে বি.পি.এ রিসেপটরের কাজ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মৌলিক ইস্ট্রোজেন রিসেপটরের (ER) মত নতুন ধরণের রিসেপটর (**ERRy**) ইঁদুর, জেব্রাফিস এবং মানুষের মধ্যে আবিস্কৃত হয়েছে। আপাতভাবে এগুলো বি.পি.এ অনুর সাথে যুক্ত হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেখানে যেখানে রিসেপটর রয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রভাব ফেলে। এছাড়াও প্রজনন অঙ্গসমূহ, হাড়পাঁজর, পেশীতন্তু এবং হৃৎপিন্ডেও এই নতুন রিসেপটরের (ERRy) উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি, শুক্রাণুর রূপান্তর, অকাল বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্তি, জরায়ুর অন্তঃস্তরে পরিবর্তন, হাঁপানী, বহুমূত্র, স্থূলতার মত অসুখের পেছনেও বি.পি.এ জড়িত বলে এখন জানা যাচ্ছে। শৈশবে, গর্ভাবস্থায় এমনকি গর্ভধারণের আগেও যদি বি.পি.এ শরীরে ঢুকে পড়ে তবে তা শিশু বা অল্পবয়সীদের স্নায়বিক কার্যকলাপেও বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। কয়েকজন গবেষকদের মতে পুরুষদের শুক্রাশয়ের টিউমার ও মহিলাদের যোনিপথ ও স্তনের টিউমার'র জন্য বি.পি.এ-ই দায়ী। ইস্ট্রোজেন রিসেপটরের চেয়ে ERRy রিসেপটরের প্রতি বি.পি.এ'র আকর্ষণ ১০০০গুণ বেশি হওয়ায় খুব অল্পমাত্রায় হলেও আমাদের দেহে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

২০১০-এর নভেম্বরে কানাডায় অটোয়াতে হু'র কনভেনশনে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্ট হেলথ সায়েন্সের পক্ষে ক্রিস্টিনা অ্যান থায়ার ও ইউনাইটেড টেস্টস ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ অ্যান্ড হিউমান সার্ভিসেস'র ডঃ স্কট বেলচার এক গবেষণা পত্র পেশ করেন। গবেষণা পত্রে বলা হয়, বি.পি.এ'র ইস্ট্রোজেনধর্মী সক্রিয়তা থাকতে পারে, কিন্তু এটা কখনই ভাবা উচিত নয় বি.পি.এ শুধুমাত্র ইস্ট্রোজেন অথবা নির্দিষ্ট ইস্ট্রোজেন রিপেটর মডিউলেটর হিসেবে কাজ করে।

ইউরোপীয়ান খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের মতে মানুষের শরীরে বি.পি.এ'র দৈনিক সহনশীল গ্রহণীয় মাত্রা প্রতি কেজিতে ৫০ মাইক্রোগ্রাম। ২০০৩-০৪ এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা ২৫০০ জনের ওপর গবেষণা চালিয়ে ৯৩ শতাংশের মূত্রে বেশী মাত্রায় অবিপাকীয় বি. পি.এ'র উপস্থিতি পায়। ২০০৯'এ কানাডায় স্বাস্থ্যবিভাগ পাত্রবন্দী মৃদু পানীয়ের পরীক্ষায় পরিমাপযোগ্য বি.পি.এ'র নমুনা পায়। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ ২০১০-এ অন্য এক পরীক্ষায় পাত্রস্থ খাবার ও শিশুখাদ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশী বি.পি.এ পায়। আবার ২০১১তে পরিবেশ স্বাস্থ্যবিষয়ক সমীক্ষায় ২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের মূত্র পরীক্ষায় দেখা যায় যখন তারা রেস্টুরেন্ট ও মোড়কজাত খাবারের ওপরে নির্ভরশীল তখন যে পরিমাণ বি.পি.এ পাওয়া যাচ্ছে টাটকা-সতেজ খাবার গ্রহণে তা ৫০-৭০ শতাংশ কমছে। গবেষণায় আরো জানা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মূত্রে বি.পি.এ'র উপস্থিতি রয়েছে। এবং বিদ্যালয়ের দুপুরের খাবারে সোডা ওয়াটার এবং মোড়কজাত খাবার গ্রহণ করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মূত্রেও উচ্চতর মাত্রায় বি.পি.এ পাওয়া গেছে।

দেশজুড়ে গণপ্রতিবাদ এবং সদ্যজাত শিশুর মধ্যে বি.পি.এ'র বিপাকীয় ক্ষমতা লক্ষ্য করে কানাডা (২০০৮), ইউরোপীয় ইউনিয়ন (২০১১) ফ্রান্স (২০১০), সুইডেন (২০১৩) বেলজিয়াম(২০১৩) মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রাজ্য (২০১২) এবং চীন সরকার (২০১১) শিশুদের বোতল, চুমুক দেওয়া খাবার পাত্র, শিশু খাদ্যের মোড়ক এবং শিশুদের উপযোগী পাত্র তৈরীতে বি.পি.এ'র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কিছু প্লাস্টিক উৎপাদক বি.পি.এ নিষিদ্ধ ঘোষণা কার্যকরী হবার আগেই স্বেচ্ছায় উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। ২০১২ সালে এ. সি. সি. (American Chemistry Council) শক্তিশালী প্লাস্টিক শিল্পের পক্ষে কৌশলগত ভাবে আর্জি পেশ করায় F. D. A.-কে খুঁচিয়ে বি.পি.এ-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করে, কিন্তু তা শুধুমাত্র শিশু পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে।

২০১২ সালে ইউরোপের ফুড অ্যান্ড সেফটি অথরিটি যকৃত, কিডনি এবং স্তনগ্রন্থির ওপর এই রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব সুনিশ্চিত করেছে। এর ফলে বর্তমান দৈনিক সহনশীল গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা ৫০ মাইক্রোগ্রাম/প্রতি কেজি/শারীরিক ওজন/দৈনিক (অথবা ০.০৫ মাইক্রো গ্রাম/প্রতি কেজি/শারীরিক ওজন/দৈনিক)। কর্তৃপক্ষ আরো উল্লেখ করেন অন্যান্য একাধিক শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে কম হলেও অনিশ্চয়তা থাকছেই। ২০১৩-তে প্রকাশিত "Late lessons from early warning" (Andreas gies and Ana m. soto) বইয়ের ১০ম পরিচ্ছদে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া না বুঝে যে কোনও রাসায়নিকের ব্যবহারের যে পুরোনো ট্রাডিশন, বি.পি.এ'র ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। এবং এর পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সমাধান করতে গিয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হচ্ছে। ফলে একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্যও বিপন্ন হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে বি.পি.এ'র গল্পের সাথে অ্যাসবেস্টরস্, পলিক্লোরিনেটেড-বাই-ফিনাইল এবং ডাই-ইথাইলস্টিলবোট্রল (DES)-র অনেক মিল আছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মানবদেহসহ অন্যান্য প্রাণীদেহে বি.পি.এ'র ক্ষতিকারক প্রভাব কমানো প্রয়োজন কারণ ইঁদুর গোত্রীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক প্রভাব এবং মানুষের ক্ষেত্রে আচরণ গত পরিবর্তনের মত বিষয়টি এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডিসে ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে।

২০১৪ সালে দ্য জার্নাল অফ দ্য ফেডারেশন অফ আমেরিকান সোসাইটিজ ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি আমাদের শরীরে বি.পি.এ প্রবেশের নতুন পথ এবং রিসেপটর সম্বন্ধে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে। ডেকিন'র বিপাকীয় গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক ডঃ ইয়ান গিবার্ট'র মতে "আমরা জানি স্থূলতা এবং বহুমূত্রের মত রোগের সাথে বি.পি.এ'র একটা যোগাযোগ আছে। কিন্তু আমরা এখনও এর কার্যকারীতা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। যে নতুন ধরণের রিসেপটর (ERRy) আমরা আবিস্কার করেছি হয়তো এতে কোন যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমেরিকান কেমিস্ট্রি কাউন্সিল'র www.bisphenola.org ওয়েবসাইটে (যা কয়েক ডজন প্লাস্টিক উৎপাদক কোম্পানীর প্রতিনিধিকারী) বলা হয়েছে, "বি.পি.এ'র বিষক্রিয়া ভালোভাবেই জানা গেছে এবং দেখা গেছে খুব বেশি মাত্রায় বি.পি.এ দূষণে বিষক্রিয়াজনিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়," কথাটা মানুষকে গুলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সবচেয়ে মজার বিষয় হল প্রত্যেকটি সফল গবেষণা পূর্ববর্তী গবেষণালব্ধ ফলকে নাকচ করে এবং আমাদের সামনে যেগুলো সামনে আসে তা কয়েকশো গবেষণার মধ্যে শুধুমাত্র কয়েকটির ফলাফল।

এখন প্রশ্ন আমাদের কী করণীয়? ইতিমধ্যে বাজারে বি.পি.এ মুক্ত পণ্য আসতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে পণ্যটির বি.পি.এ মুক্ত চিহ্ন আছে কিনা দেখে নিতে হবে। যদি কোন চিহ্ন না থাকে মনে রাখতে হবে সব না হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুনর্নির্মিত প্লাস্টিক চিহ্ন ৩ বা ৭ যার মধ্যে বি.পি.এ উপস্থিত থাকতে পারে। আবার সাম্প্রতিক প্রমাণ অনুযায়ী বি.পি.এ মুক্ত পণ্য নিরাপদ নাও হতে পারে। বি.পি.এ'র পরিবর্তে ব্যবহৃত বি.পি.এস ও এন্ডোক্রিন গ্রন্থির বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে বি.পি.এ মুক্ত প্লাস্টিকে আরো ১০ ধরণের রাসায়নিক থাকে যাদের ইস্ট্রোজেনধর্মী সক্রিয়তা রয়েছে।

আমাদের উচিত পাত্রবন্দী খাবার বর্জন করা। কারণ বেশীর ভাগ পাত্রের ভেতরের আস্তরণে বি.পি.এ থাকে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সায়েন্স'র মতে পলিকার্বোনেট প্লাস্টিক পাত্র মাইক্রোওভেনে রাখা অথবা ধোবার যন্ত্রে রাখা বিপজ্জনক। কারণ উত্তাপ বা ঘর্ষণের কারণে বি.পি.এ প্লাস্টিক থেকে মুক্ত হয়ে খাবারে মিশে যাবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাঁচ, পের্সেলিন অথবা স্টেইনলেস স্টীলের পাত্র গরম খাবার বা পাণীয় রাখার জন্য ব্যবহার করা উচিত। মূল কৌশল হচ্ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার যতক্ষণ সম্ভব এড়িয়ে চলা। যেহেতু সম্পূর্ণভাবে এখনই একে এড়িয়ে চলা যাচ্ছে না। এবং আরও গবেষণালব্ধ ফলাফলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

আমাদের যে যে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত... ১. মাইক্রোওভেনে পপর্কন এবং ফাস্টফুড গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে আনা। ২. মাইক্রোওভেনে প্লাস্টিকের পরিবর্তে কাগজের তোয়ালে ব্যবহার। ৩. প্লাস্টিক পাত্রে খাবার মাইক্রোওভেনে না দিয়ে পরিবর্তে চীনামাটির পাত্র ব্যবহার। ৪. তুলনায় নিরাপদ কাঁচ অথবা স্টেইনলেস স্টীলের পাত্র ব্যবহার। ৫. ৩ বা ৭ সংখ্যা চিহ্নিত প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার এড়িয়ে চলা। ১নং প্লাস্টিক যা মূলত জল ও সোডার বোতলে ব্যবহৃত হয় তা মাত্র একবার ব্যবহারের পর পুর্নির্নিমিত করা দরকার। ৬. প্লাস্টিকের পরিবর্তে বরং কাঁচ অথবা পাইরেক্স জাতীয় পাত্রে খাবার রাখা উচিত। ৭. ঘর্ষণযুক্ত অথবা পুরনো প্লাস্টিক পাত্র ব্যবহার বর্জন। ৮. ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের কারণে প্লাস্টিক পাত্রের হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহার কমানো।

এড়িয়ে চলুন... ১. শিশুদের প্লাস্টিক বোতল। ২. প্লাস্টিক টেবিল ঢাকনা। ৩. খাবার রাখার প্লাস্টিক পাত্র। ৪. দাঁতের ক্ষয়পূরণের উপাদান। ৫. প্লাস্টিক বোতলের ফলের রস এবং জলের বোতল। ৬. খাবারে আটকে থাকা পাতলা আস্তরণ। ৭. সব ধরণের পাত্রবন্দী খাবার। ৮. পি.ভি.সি (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) ব্যবহার।

মৌ জগত এবং তাদের ভালো থাকা, মন্দ থাকা

রূপক কুমার পাল

শীত পেরিয়ে বসন্ত এলে শুরু হয় ওদের কর্মব্যস্ততা। বাতাসের উত্তাপ যে একটু একটু করে বাড়ে শুধু তাই নয়, চারপাশে তৈরি হয় বৈচিত্রময় ফুলের সমারোহ। এখন পরাগ সংগ্রহের সময়। আরো বেশি বেশি করে মধু সংগ্রহের সময়। এ ঋতু প্রজননের আদর্শ ঋতু। প্রজননের বারো মাসই সম্ভব, তবে বসন্তের প্রজননের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এ সময় নতুন প্রজন্মের রানীর আবির্ভাব ঘটে। পুরোনো রানী একটু একটু করে মানসিক প্রস্তুতি যেমন নেয় তেমনি কর্মীদের একাংশ ঘরদোর গোছাতে ব্যস্ত। কর্মীর আরেকটি দল হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় মধুর উৎস সন্ধানে, পরাগের খোঁজে। চাকে ফিরে নানান ভঙ্গিমায় নেচে নেচে জানান দেয়। একেকটা নাচের আঙ্গিক যেন একেকটা পরিশীলিত বাক্যবন্ধ। তাতে দিব্যি বোঝা যায় কোন দিকে, কত দূরে, ঠিক কোথায় কোন জাতের মধুর উৎস রয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঝাঁক বেঁধে সেদিকেই ছুট লাগায় বাকি কর্মীর দল। তবে ভুল সংবাদ দিলে অপরাধী মৌমাছিকে মেরে ফেলার রেওয়াজও রয়েছে। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, দলীয় অনুশাসন আর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এভাবেই এগিয়ে চলে গোষ্ঠীবদ্ধ মৌচাক জীবন।

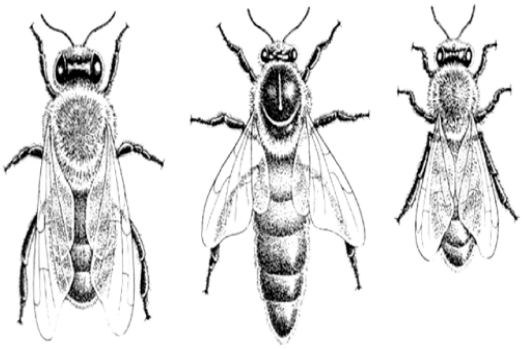

Drone Queen Worker

ডিম ফুটে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা, পিউপা থেকে পূণাঙ্গ মৌমাছি—এই বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে কতটা সময় লাগবে তা নির্ভর করে মৌমাছির জীবসত্ত্বার ওপর, আর খানিকটা নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপর। সামাজিক শ্রমবিভাজন এবং লিঙ্গ নির্ধারণের নিরিখে মৌচাকে তিন জাতের মৌমাছি থাকে—রানী, পুরুষ এবং কর্মী। রানী এবং কর্মী উভয়েই স্ত্রী প্রজাতির। তবে পার্থক্য একটাই, তা হলো রানী ডিম পারতে সক্ষম। অন্যদিকে কর্মীদের সে সামর্থ্য নেই। মেটিংয়ের আগে রানী ডিম পাড়লে তা অনিষিক্ত ডিম এবং সেই ডিম থেকে কেবল পুরুষ মৌমাছিরই জন্ম হয়। মেটিংয়ের পরে রানী যে নিষিক্ত ডিম পাড়ে তা থেকে নতুন রানী কিম্বা কর্মী মৌমাছির আবির্ভাব ঘটে। এখন রানী না কর্মী কী হবে তা নির্ভর করে লার্ভার পরিচর্যার ওপর। ডিম পাড়ার তিন দিনের মাথায় লার্ভার জন্ম হয়। লার্ভার তিন দিন বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ ডিম পাড়ার সময় থেকে ছয় দিন পর্যন্ত কর্মীরা সব লার্ভাদেরই রয়্যাল জেলি (কর্মীদের মাথার বিশেষ থলি থেকে নিসৃত এক দুষ্প্রাপ্য ঘন তরল বিশেষ) খাওয়ায়। এর পর নিষিক্ত ডিম থেকে জন্ম নেওয়া লার্ভাদের মধ্যে যাদের রানী মৌমাছিতে পরিণত করা হবে বলে কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের আরো সাড়ে পাঁচদিন একই ভাবে রয়্যাল জেলি খাওয়ানো হয় এবং তারপর ওই লার্ভারা পিউপায় রূপান্তরিত হয়। অন্যদিকে যাদের কর্মী মৌমাছিতে রূপান্তরিত করা হবে তাদের মধু আর পরাগের মিশ্রণে তৈরি 'মৌরুটি' নামে পরিচিত এক বিশেষ ধরণের খাবার খেতে দেয় এবং ডিম পাড়া থেকে নয় দিনের মাথায় তারা পিউপা রূপ ধারণ করে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অনিষিক্ত ডিম থেকে পিউপা হতে সাড়ে নয় দিন সময় লাগে। এর পরের পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ মৌমাছি। ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ রানী বেরিয়ে আসে ১৬ দিনের মাথায়। কর্মীরা জন্মায় ১৮-২২ দিন পর আর পূর্ণাঙ্গ পুরুষ আসে ২৪ দিনে। তবে আবহাওয়া অনুকূল না থাকলে বিশেষ করে অতিরিক্ত ঠান্ডায় বা টানা বর্ষায় এই জীবন চক্র সম্পন্ন হতে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন।

পূর্ণাঙ্গ কর্মীরা মাত্র ছয় সপ্তাহ বাঁচে। পুরুষ বেঁচে থাকে দু-তিন মাস। অপর দিকে রানীর জীবনকাল ৩-৪ বছর। তবে অনুকূল আবহাওয়া থাকলে কখনও পাঁচ বছর পর্যন্তও রানীরা বাঁচে। জন্মানোর সাত দিন পর থেকে রানী মেটিংয়ের সামর্থ্য অর্জন করে। পুরুষরা মেটিংয়ের উপযুক্ত হয় জন্মানোর প্রায় নয় দিন পরে। রানী বা পুরুষ তাদের জীবদ্দশায় একবারই মেটিং করে এবং মেটিং-এর পর পুরুষ মৌমাছিটি মারা যায়। অপর দিকে, রানী মেটিং এর তিন দিনের মাথায় নিষিক্ত ডিম পাড়ার উপযুক্ত হয়। উপযুক্ত আবহাওয়ায় রানী দিনে দেড় থেকে দু-হাজার ডিম পাড়তে সক্ষম। কোনো কারণে মেটিং-এ দেরি হয়ে গেলে অনিষিক্ত ডিম পাড়তে শুরু করে দেয়। মেটিংয়ের সময় পুরুষের শরীর থেকে রানীর শরীরে প্রায় ৫০ লক্ষ স্পার্মাটোজোয়া স্থানান্তরিত হয় এবং তা জমা হয় স্পার্মাথেকা নামে এক বিশেষ থলিতে। বয়স বেড়ে গেলে ওই স্পার্মাটোজোয়া নিঃশেষ হয়ে যায় এবং তখন রানী আবার অনিষিক্ত ডিম পাড়তে শুরু করে এবং ডিমের সংখ্যাও কমে আসে। এভাবে একটা পর্যায় পর ডিম পাড়া বন্ধই করে দেয়। এরকম পরিস্থিতি আগেভাগে অনুমান করে কর্মীরা নতুন রানীর আগমনের ব্যবস্থা করে। এবং বয়স্ক রানীকে তাড়িয়ে দেয় কিম্বা মেরে ফেলে।

কখনও রানী কলোনী ছেড়ে পালিয়ে গেলে কিম্বা তার অপমৃত্যু ঘটলে বা বয়স বৃদ্ধি বা অন্য কোনও কারণে ডিম পাড়ার সামর্থ্য হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেলে বংশ রক্ষার তাগিদে কর্মীরা তিনদিনের কম বয়সি লার্ভাদের রয়্যাল জেলি খাইয়ে নতুন রানী তৈরি করে নেয়। সেটা সম্ভব না হলে তারা নিজেরা বেশি বেশি করে পরাগ আর মধু খেয়ে তাদের ওভারি বড় করে নেয় এবং তখন তারাও ডিম পারতে সক্ষম হয়। তবে সেই ডিম আনফার্টিলাইজড হওয়ায় তা থেকে শুধু পুরুষ মৌমাছি জন্ম নেয়। ফলে চাকে পুরুষ মৌমাছির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। মৌ-পালকরা এই অতি সংখ্যায় পুরুষ মৌমাছি দেখে বুঝে যান যে চাকে রানী নেই অথবা রানী ডিম পাড়ার সামর্থ্য হারিয়েছে। এটা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। প্রকৃতিতে

এরকম অবস্থায় সেই মৌ-কলোনী ধ্বংস হয়ে যায়। তবে বাক্সে প্রতিপালন করা মৌচাকে মৌপালকরা দ্রুত কোনোভাবে নতুন রানীর অনুপ্রবেশ ঘটালে স্বাভাবিক অবস্থার পুনরুদ্ধার সম্ভব। আবার টানা বর্ষার কারণে অনেক সময় নতুন রানী জন্মানোর পর প্রায় মাস-খানেক মেটিং করতে না পারলে এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এরকম পরিস্থিতিতেও সে আনফার্টিলাইজড ডিম পাড়া শুরু করে এবং চাকে পুরুষের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। একটি মাত্র পরিণত রানী, ২০-৮০ হাজার পরিণত কর্মী এবং ৩০০-৮০০ পরিণত পুরুষ মৌমাছি নিয়ে একটি মৌ-কলোনী তৈরি হয়। এর সঙ্গে প্রায় ৫ হাজার ডিম, প্রজননের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা ২৫-৩০ হাজার অপরিণত মৌমাছি। এদের মধ্যে লার্ভা থাকে প্রায় ১০ হাজার। বাকিটা সিল করা পিউপা। সাধারণত বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য যে কক্ষ কর্মীরা তৈরি করে সেগুলো চাকের নিচের দিকে থাকে, আর ওপরের কক্ষগুলোতে মজুত থাকে মধু ও পরাগ।

মধু সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় লম্বা শুঁড় (proboscis) কিম্বা পরাগ বহন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরাগ থলি (pollen busket) রানীর থাকে না। দেহে মোম নিঃসরণ গ্রন্থিও (wax gland) নেই। স্বাভাবিক কারণেই রানী মধু, পরাগ, জল, কিম্বা প্রপোলিস (propolis, উদ্ভিদের দেহ নিসৃত এক ধরনের তরল বিশেষ) সংগ্রহ করতে পারে না। পারে না ঘর নির্মাণ করতে, এমনকি নিজের খাওয়ারও নিজে খেতে পারে না। কর্মীরাই তাকে খাইয়ে দেয়। ডিম পাড়াই রানীর একমাত্র কাজ। তার একটি হুল অবশ্যই আছে। কিন্তু সাধারণত শত্রু দমনে সেটাকে ব্যবহার করে না। শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ রানীদের প্রাণ নাশে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

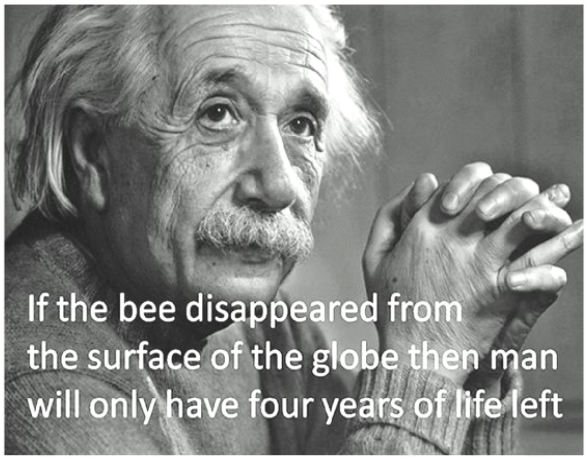

রানীর মতো পুরুষদেরও ওই সমস্ত অঙ্গ নেই। তাকেও কর্মীরাই খাইয়ে দেয়। তাদের হুলও নেই যে নিজেকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কর্মীরাই তাদের সুরক্ষা দেয়। তাদের একমাত্র কাজ রানীর সঙ্গে মেটিং-এ অংশ নেওয়া। ওদের চোখের আকার অবশ্য রানী কিম্বা কর্মীদের তুলনায় দ্বিগুন হয়। এবং তারা দুটো চোখকে মাথার ওপর দিকে এক জায়গায় টেনে আনতে পারে। এই সুবিধের জন্য মেটিং এর প্রয়োজনে রানীকে মুহূর্তের মধ্যে খুঁজে বার করতে তারা সক্ষম। শুধু তাই নয়, মেটিং এর সময় তার রানীকে সারাক্ষণ দেখতেও পায়। ওদের ডানার আকারও সব চেয়ে বড়। অনেকক্ষণ উড়তে পারে এবং রানীকে দেখা মাত্র দ্রুত উড়ে তার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। একজন পুরুষ মেটিং এর জন্য ৮ কিমি পথ পেরিয়ে রানীর কাছে পৌঁছতে পারে। সাধারণত ভালো আবহাওয়া দেখে দুপুরের পরপর ওরা উড়ান দেয়। মৌচাকে আমরা মৌমাছিদের যে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুনতে পাই সেটা কিন্তু একমাত্র পুরুষরাই করে। তারা যেখানেই যায় ওরকম আওয়াজ করতে করতেই যায়। কর্মীরা যে আওয়াজ করে না তা নয়, কিন্তু সাধারণত বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে তবেই তারা শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য আওয়াজ করে।

মৌ-কলোনীর ৯৮ শতাংশই কর্মী মৌমাছি। মৌচাকের যাবতীয় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম অঙ্গ কর্মীদের শরীরে রয়েছে। মধু কিম্বা প্রপোলিস সংগ্রহের রয়েছে লম্বা শুঁড়, মধু বহনের জন্য বড় মাপের পাকস্থলী, পরাগ বহনের জন্য পরাগ থলি, ঘর নির্মাণে ব্যবহৃত মোম গ্রন্থি, শত্রু দমনের জন্য আছে হুল। রয়্যাল জেলি যে গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় সেটা ওদের মাথাতে থাকে। চাকে জমা করা মধু পাকার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক নিঃসরণের গ্রন্থিও রয়েছে ওদেরই শরীরে।

কর্মীদের জীবৎকাল মাত্র ছয় সপ্তাহ। প্রথম তিন সপ্তাহ ওরা চাকের মধ্যেকার গৃহকর্ত্রীর কাজ করে। এই পর্যায়ে এদের বলা হয় house bee। শেষের তিন সপ্তাহে এরা মধু সংগ্রহ সহ মাঠের যাবতীয় কাজ করে। এদের বলা হয় field bee। পিউপা থেকে বেরিয়ে এসে পিউপা কক্ষেই একজন কর্মী প্রথমে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিস্কার করে। তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে খাবার খায়। এরপর শুরু হয় নিরলসভাবে ঘরদোর পরিস্কারের কাজ। দিন পাঁচেকের মধ্যে ওদের মাথার গ্রন্থি থেকে রয়্যাল জেলি নিঃসরণ হতে শুরু করলে কিম্বা মৌ-দুগ্ধ (কর্মীদের শরীর নিঃসৃত এক তরল বিশেষ যা কিনা লার্ভাদের খাবার) নিঃসরণ হতে শুরু করলে পদমর্যাদা একটু বাড়ে। এই পর্যায়ে ওদের বলা হয় nurse bee। এদের কাজ মূলতঃ বাচ্চাদের খাওয়ানো, রানীকে পরিচর্যা করা। রানীকে ওরা শুধু খাওয়ায় না, তাকে স্নানও করায়। এর ফাঁকে ফাঁকে ওরা উড়ানের মহড়া দেয়। প্রথমে চাকের চারপাশে সামান্য একটু সময় ওড়ে। একটু একটু করে ওড়ার সময় এবং দূরত্ব দু-ই বাড়াতে থাকে। লক্ষ্য হলো চারপাশটাকে চিনে নেওয়া। চাক থেকে বেরিয়ে আবার চাকে ফিরে আসতে পারছে কিনা চলে তারই প্রশিক্ষণ। দু-সপ্তাহ বয়স হলে ওদের মোম গ্রন্থি থেকে মোম নিঃসরণ শুরু হয়। এখন তারা গৃহ নির্মাণে সক্ষম। বেশি বেশি করে যাতে মোম নিসৃত হয় তার জন্য তারা এই সময় বেশি বেশি করে মধু আর মোম খায়। এই পর্যায়ে গরমের সময় চাকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চাকে নিয়মিত হাওয়া করে। বারো জন কর্মী চাকে ২৫ সেমি দূরত্বে আড়াআড়ি অবস্থান করে মিনিটে ৫০-৬০ লিটার বাতাসের প্রবাহ তৈরি করতে সক্ষম। এর সঙ্গে মধু আর পরাগ প্যাকিং করে কীভাবে মজুত করতে হবে তাও শিখে নেয়। সাধারণত ফুল থেকে সংগ্রহ করা কাঁচা মধুতে (nectar) ২০ শতাংশ সুগার আর ৮০ শতাংশ জল থাকে। কর্মীদের দেহ নিঃসৃত উৎসেচক ওই মধুর মধ্যে পরিমাণ মতো মিশিয়ে কোনো মধু কক্ষ (honey cell) সিল করে রাখলে কয়েক দিনে তা পাকা মধুতে পরিণত হয়। আমরা বাজার থেকে যে মধু কিনে খাই তা কিন্তু আসলে এই পাকা মধু। এতে ৮০ শতাংশ সুগার এবং ২০ শতাংশ জল থাকে। গৃহকর্ত্রীর শেষ পর্যায়ে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল—চাক পরিদর্শন এবং পাহারা দেওয়া। চাক পরিদর্শন

বলতে মূলতঃ ওরা দেখে চাকে কোনও রোগের আবির্ভাব হয়েছে কিনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কোনও অস্বাভাবিকতা তৈরি হল কিনা, রানীর মধ্যে কিম্বা কোনও পুরুষের মধ্যে কোনও রকম অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়েছে কিনা এ সমস্ত। আর পাহারার ক্ষেত্রে ওরা মূলতঃ খেয়াল রাখে চাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হয়েছে কিনা। যে সমস্ত কর্মীরা মধু সংগ্রহ করে চাকে ফিরছে তাদের গন্ধ শুঁকে তল্লাশি চালায়। সন্তুষ্ট হলে তবেই চাকে ঢুকতে দেয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হলে প্রথমে প্রহরায় থাকা কর্মীরা বিকট চিৎকার করে ওদের ভয় দেখায়। তাতে কাজ না হলে সরাসরি হুল ফুঁটিয়ে ওদের ওপর আক্রমণ চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরোনোর আগেই ওরা ফেরোমোন ছড়িয়ে বাকি কর্মীদের ওই আক্রমণের সংবাদ জানান দেয় এবং তৎক্ষনাৎ সবাই মিলে হুল উঁচিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সপ্তাহ তিনেক বয়স হলে কর্মীদের রয়্যাল জেলি কিম্বা মোম নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় মধু পাকানোর জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক নিঃসরণও। শরীরও বেশ শক্তপোক্ত হয়েছে। অনেকক্ষণ উড়তেও পারে। সুতরাং এখন গৃহকর্মের সময় শেষ। শুরু হয় মাঠের কাজ। মাঠের কাজ মূলতঃ দুটি। এক, মধু-পরাগ ও জল সংগ্রহ করা। এই কাজে যুক্ত মৌমাছিদের forager bee বলে। দুই, খাদ্যের উৎস খোঁজা এবং অন্য কোথায় চাক বাঁধা যেতে পারে সেই উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করা। যারা এই কাজে নিযুক্ত তাদের scout bee বলে। খাদ্যে বা পানীয়তে টান পড়লে অন্য চাক আক্রমণ করে সেসব ছিনিয়ে আনার মতো দুষ্কর্মও ওই scout bee রাই করে। একজন কর্মী তার শরীরের ওজনের ৮৫ শতাংশ ওজন বিশিষ্ট খাদ্য বহন করতে পারে। সাধারণত খুব সকালের দিকে ওরা মধু সংগ্রহে বের হয়। খরাপ্রবণ এলাকায় জলের তীব্র অভাব থাকলে অনেক সময় দেখা গেছে মাঠের চাষিদের আক্রমণ করে ওদের শরীর থেকে ঘাম শুষে নিয়ে যাচ্ছে কর্মীর দল। বসত বাড়ির রান্নাঘর, কলপার, বাথরুমের আশপাশের স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাগুলো থেকে ওরা জল সংগ্রহ করে থাকে এবং সেটা করে তখনই যখন প্রচন্ড খরায় খাল-বিল শুকিয়ে যায়।

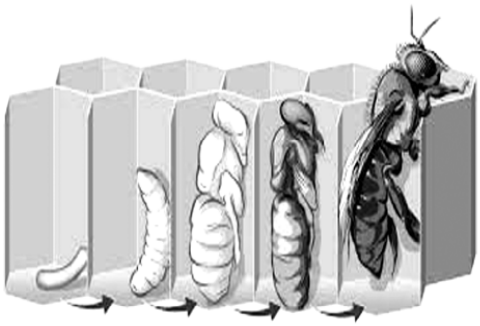

চাকে মৌমাছির সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেলে পিউপা পর্যায় থেকে নতুন রানী বের হওয়ার কয়েক দিন আগে কর্মীরা পুরনো রানীকে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোথাও নতুন করে চাক বাঁধার জন্য পাড়ি জমায়। এই ঘটনাকে মৌ-গবেষকদের ভাষায় বলা হয় swarming। scout মৌমাছিরা আগে থেকে উপযুক্ত স্থান বেছে রাখে এবং সে খবর বাকি কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ভাল আবহাওয়া দেখে ওরা যাত্রা শুরু করে। প্রায় অর্ধেক পথ পেরনোর পরে কিছুক্ষণের জন্য একটু বিশ্রাম এবং তার পর গন্তব্যে পৌঁছনো। Swarm এর সময় প্রথম সারিতে থাকে scout মৌমাছির দল, পেছনে রানীকে ঘিরে থাকে কর্মীরা। বিশ্রামের সময় কর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেয়াল রাখে রানী তাদের সঙ্গে আছে কিনা।

পুরনো চাকে পিউপা পর্যায় থেকে নতুন রানী বের হওয়ার পর সে প্রথমেই চাকের আনাচে কানাচে ঘুরে ফিরে দেখে নেয় অন্য কোথাও প্রতিপক্ষ কোনও রানী লুকিয়ে আছে কিনা। এমন কেউ থাকলে শুরু হয় লড়াই। যতক্ষণ না কেউ একজন মারা পড়ছে, লড়াই চলতেই থাকে। যদি এমন কোনও রানী না থাকে তাহলে নতুন রানী খোঁজ করে আর কোন রানী কক্ষে নতুন রানীরা বেড়ে উঠছে, সেটা নজর রাখে। এর জন্য রানী এক বিশেষ ধরনের আওয়াজ করে। রানী কক্ষগুলো থেকে সম্ভাব্য অপরিণত রানীরা তাতে আকৃষ্ট হয়ে তাদের উপস্থিতি জানান দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব কক্ষ চিহ্নিত করে তাতে আক্রমণ চালিয়ে ওই সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রানীদের মেরে ফেলে। প্রতিষ্ঠিত হয় রানীর একক উপস্থিতি। জন্মানোর পাঁচ দিনের মাথায় নতুন রানী মিনিট পাঁচেকের জন্য উড়ানের মহড়া দেয়। তারপর পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চূড়ান্ত উড়ান। ÛËBÂõËu nuptial flight। মাটি থেকে ৬-১০ মিটার উচ্চতায় প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে মেটিং। ওই উচ্চাতাতে পুরুষদের কাছ রানী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অন্ততঃ আটজন পুরুষের সঙ্গে মেটিং চলে। তাতে রানী সন্তুষ্ট না হলে পরদিন আবারও মেটিং-এ বের হয়। মেটিং এর তিন দিন পর থেকে রানী ডিম পাড়তে শুরু করে। শুরু হয় স্থিতিশীল দিনযাপন।

মৌমাছিদের এই ঈর্ষণীয় সমাজ জীবন আসলে দীর্ঘ অভিব্যক্তি আর অভিযোজনের ফসল। প্রকৃতির সঙ্গে ওদের দিনযাপনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মৌমাছির বারমাস্যা রীতিমতো ঋতু মেনে চলে। সেজন্য ভৌগলিক এলাকা ভেদে এর পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। আলোচনায় বলা হয়েছে যে পুরুষরা মধু সংগ্রহ কিম্বা মধু পান করতে পারে না। কর্মীরা ওদের খাইয়ে দেয়। তা কিন্তু এশীয় এবং ইউরোপীয় মৌমাছিদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। ব্রাজিলের আমাজন অরণ্যে ইউগ্লোসা (Euglossa) নামে এক প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায় যাদের পুরুষরা রীতিমতো ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে এবং নিজেরাই পান করে। কর্মীদের ওপর নির্ভরশীল নয়। আমাজনের ব্রাজিল নাট গাছের কথা সারা পৃথিবী জানে। কারণ ব্রাজিল প্রতি বছর প্রায় ৫০ হাজার টন ব্রাজিল নাট রপ্তানি করে। ওদেশে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। চাষ সম্ভব নয়, অরণ্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কারণ ওই গাছের পরাগ সংযোগ একমাত্র ওই অরণ্যের ইউগ্লোসা প্রজাতির স্ত্রী মৌমাছিই করাতে পারে এবং ওই স্ত্রী মৌমাছি কেবল মাত্র ব্রাজিল নাটের মধু খেয়েই বাঁচে। বসত এলাকায় ওই মৌমাছি তাই পাওয়াও যায় না। ইউগ্লোসা প্রজাতির পুরুষ মৌমাছি এক বিশেষ প্রজাতির অর্কিডের ওপর নির্ভরশীল যা আবার কেবল মাত্র ওই অরণ্যেই পাওয়া যায়। পুরুষরা ওই অর্কিডের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করার সময় ফুলের মধ্যেকার এক বিশেষ সুগন্ধযুক্ত পদার্থ সংগ্রহ করে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। সেই গন্ধ পেয়ে বাকি পুরুষরাও একইভাবে গন্ধ ছড়ায়। এরকম চলতে থাকলে কিছুক্ষণের মধ্যে চতুর্দিকে এমন এক সুগন্ধের বাতাবরণ তৈরি হয় যে স্ত্রী মৌমাছিরা আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে। তারপর মেটিং। তৈরি হয় নতুন মৌ-প্রজন্ম। বোঝাই যাচ্ছে, অর্কিড, ব্রাজিল নাট এবং ইউগ্লোসা—এক অভিনব পারস্পরিক নির্ভরশীল জীবনশৈলী যা আমাজনের অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই তিনের মধ্যে যে কোনও একটি না থাকলে পুরো বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামোটাই ভেঙে যাবে। ধসে পড়বে ব্রাজিল নাট নির্ভর অর্থনীতি।

ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষরা বিভিন্ন জায়গায় অজস্র ল্যান্ডমাইন পুঁতে রাখে। ওই ল্যান্ডমাইন খুঁজে বার করে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করা স্বাধীন সরকারের কাছে ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সেটা করতে গিয়ে ৬৬ জন বোম্ব স্কোয়াডের সদস্য মারা যায়। আচমকা বিস্ফোরণে ২৫০ জন নাগরিক সাধারণেরও মৃত্যু হয়। স্বাধীনতার ২০ বছর পরেও প্রায় ৯০ হাজার ল্যান্ডমাইন মাটির তলাতেই থেকে যায়। কিছুতেই যুতসই কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, ওগুলো চিহ্নিত করার। শেষে জাগ্রেব ইউনিভার্সিটির দু'জন অধ্যাপক—একজন হলেন মাতেজা জেনস এবং দ্বিতীয়জন, নিকোলো কেজিক এক বিশেষ পদ্ধতি বের করেন। ওই ল্যান্ডমাইনের অন্যতম একটি উপাদান হল TNT। ওই দুই অধ্যাপক প্রায় এক বছর করে মৌমাছি পালন করেন এবং মৌমাছিদের খাবারের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় TNT মিশিয়ে দেন। তাতে মৌমাছিরা বছর খানেকের মধ্যে TNT এর প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে এবং ওরকম তৈরি খাবার না দিলে ওরা উড়ে গিয়ে ওই ল্যান্ডমাইনগুলো যেখানে পোঁতা আছে সেখানে হন্যে হয়ে TNT খুঁজতে থাকে। তাদের অনুসরণ করে স্কোয়াডের সদস্যরা ল্যান্ডমাইনের স্থানগুলো অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারে। রক্ষা পায় স্বাধীন ক্রোয়েশিয়ার নাগরিকরা।

ইউরোপের পর্ণমোচী অরণ্যের তলায় অজস্র ছোট খাটো গাছগাছড়ার যে উপস্থিতি তা কিন্তু ওই এলাকার মৌমাছিদের পরাগ সংযোগের কারণেই। আবার ওই গাছেদের জন্যই মৌমাছিদের অস্তিত্ব। ডেনমার্কের কোনও কোনও অরণ্যে নাকি মৌমাছিদের উপস্থিতির জন্যই অনেক গাছগাছড়া হরিণের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছে। অরণ্য আধিকারিকরা তাদের অভিজ্ঞতা নির্ভর তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ থেকেই একথা বলেন। মার্কিন কৃষি দফতর বলছে, আমাদের চাষ করা ফসলের ৮০ শতাংশরই পরাগ সংযোগ ঘটে মৌমাছিদের দ্বারা। সুতরাং পরোক্ষে মাংস শিল্প কিম্বা দুগ্ধ শিল্প বেঁচে আছে মৌমাছিদের কল্যাণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হিসেব অনুযায়ী, এই মৌমাছিরা বছরে ১৪ বিলিয়ন ডলার অর্থমূল্যের বীজ উৎপাদন করে পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে। যদি এরা হারিয়ে যায়, তাহলে এই মানবসভ্যতার কাছে খাওয়ার হিসেবে জল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

সাধারণত একটি মৌমাছি একবার মধু সংগ্রহে বের হলে ৩০ মিনিটের মধ্যে ৫০-১০০টি ফুলে পরাগ সংযোগ ঘটে। একই মৌমাছি এরকম দিনে সাত থেকে চোদ্দবার মধু সংগ্রহে বের হয়। একটা কলোনীতে এরকম কর্মী মৌমাছি খুব কম করে হলেও ২৫ হাজার থাকে। প্রত্যেকে দিনে গড়ে ১০ বার মধু সংগ্রহে বের হয়। এবার হিসেব কষে দেখুন সারা দিনে কত ফুলের সংযোগ ঘটল। সংখ্যাটা কিন্তু ২৫০ মিলিয়ন। একদিকে ওই পরাগ ছাড়া মৌমাছিদের পুষ্টি হবে না, তৈরি হবে না রয়্যাল জেলি, নিঃসৃত হবে না মৌ-দুগ্ধ (bee milk, কর্মীদের দেহ নিঃসৃত তরল বিশেষ যাতে পরাগ মিশিয়ে ওরা মৌ-রুটি নামে এক বিশেষ খাবার তৈরি করে লার্ভাদের খাওয়ানোর জন্য) কিম্বা মোম। শুধু তাই নয় মৌমাছিদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে উঠবে না। অন্যদিকে মৌমাছিদের হস্তক্ষেপ পরাগ সংযোগেও অপরিহার্য্য—কেমন এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক আত্মীয়তায় ওরা এঁটে রয়েছে।

Bee venom এর ঔষধি মূল্য এখন সবাই জানে। Arthritis, multiple sclerosis, fibromyalgia এবং সম্প্রতি যৌন অস্বাভাবিকতা, ক্যানসার, epilepsy ও depression এর চিকিৎসায় এখন Bee venom ব্যবহৃত হচ্ছে।

মৌমাছিদের থেকে এই পরিমাণ পরিষেবা পাওয়ার পরও আমরা কৃষি উন্নতির নামে যে রাসায়নিক বিষ জমিতে ঢালছি তাতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে মৌ-কলোনী। ক্ষণভঙ্গুর হয়ে পড়ছে বাস্তুতন্ত্রের কাঠামো। ওই বিষ প্রয়োগে পরোক্ষে যে জলদূষণ হচ্ছে তাও একভাবে ক্ষতি করছে। অথচ নির্বিকার আমরা। এই নির্লিপ্তির ছবি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি বিত্তবানরা তাদের বাড়ির উঠোনের আগাছা দমনে বিষ ব্যবহার করছে। আগাছা কত মারা পড়ল জানি না, তবে নিশ্চিন্তভাবে ভেঙে গেল আমাদের জীয়ন কাঠি। এসব আর কবে বুঝবে মানুষ?

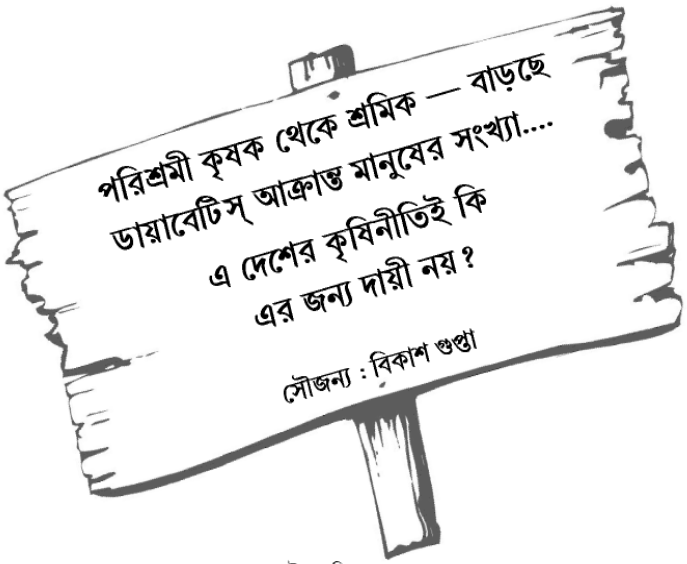

সাক্ষাৎকার

মধুদাদু'র মুখোমুখি

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

মৌমাছি নিয়ে এ রাজ্যে যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন তারা প্রায় সকলেই একবাক্যে চেনেন মধুদাদাকে। আর সেই মধুদাদার সাথে আমার পরিচয় এক মৌ-পালকের লেখার সূত্র ধরে। হাওড়ার বাওড়িয়া নিবাসী মনোজবাবুর লেখাতেই প্রথম সন্ধান মেলে মানুষটার। এমন একটা মানুষ যে মৌমাছিদের সঙ্গে ঘর-সংসার করতে করতেই জীবনের ৮৮টা বসন্ত পার করে ফেলেছেন। যে মানুষটা মৌমাছিদের মতোই এ বয়সেও সদা ভ্রাম্যমান, আজ হাওড়ার বাওড়িয়া তো কাল হুগলীর নালিকল পরশু সোনারপুর। আর সে কারণেই এক বছরের বেশী সময় লেগে গেল মানুষটার মুখোমুখি হতে। অবশেষে মনোজবাবুর উদ্যোগে ২০১৫'র ২৯ ডিসেম্বর দুপুর নাগাদ বারুইপুর স্টেশন থেকে অটোতে মিনিট কুড়ি দুরত্বে শনি-বটতলা স্টপেজের পাশেই রঙীন মাছ তৈরীর হ্যাচারির দোতলায় আট বাই ছয়ের একটা খুপরি ঘরে কথা শুরু হয় আমাদের। আমাকে দেখামাত্রই কোন প্রশ্ন বা পরিচয়পর্ব কোনটারই ভ্রুক্ষেপ না করে তিনি একনাগাড়ে কথা বলতে শুরু করেন... যেন কতদিনের পরিচিত আমি। সে সব কথাই কোন রকম পরিবর্তন বা সম্পাদনা ছাড়াই এখানে রাখা হল।

—ও আপনাকেই মনোজ পাঠিয়েছে? তা আপনারা মৌ চাষ করতে ইচ্ছুক... খুব ভাল, এটা অত্যন্ত লাভজনক। কিন্তু বাস্তবে আমি ১০ বছর ধরে চেষ্টা করেও নিজের পকেটের পয়সা খরচ করেও আমি ফেইল্ড। আমি প্রচারে আনতে পারিনি। যেটা আপনারা করতে পারেন... দুটো পথ আছে। একটা হচ্ছে সরকারকে বোঝান যে, আপনি তো উৎপাদন বাড়ার জন্য সার দেবার কথা বলছেন। সার দেবার জন্য না হয় ১৫-৩০ শতাংশ ফলন বাড়ে, কিন্তু কোন কিছু না দিয়ে শুধুমাত্র পলিনেশন ঘটিয়েই যদি ১৫-৩০ শতাংশ ফলন বাড়ান যায়। এবং তার সঙ্গে যদি উপরি পাওনা হিসেবে মধু পাওয়া যায় তাহলে আপনি কোনটা করবেন? না, আমরা সার দিতে নিষেধ করছি না। তবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমি নষ্ট-টষ্টের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোও সরকারের মাথায় ঢোকাতে হবে। এছাড়া আর একটা জায়গা আছে তাদের মাথাতেও ঢোকাতে হবে। সেটা হল নাবার্ড। একমাত্র নাবার্ডই কৃষিকাজের জন্য ব্যাঙ্ক লোন দেয়। কোনভাবে যদি তাদেরকে বোঝান যেত, তুমি তো ন্যাচারাল ফার্মিং'র পক্ষেই কথা বল, সে কারণে যেহেতু রাসায়নিক সার ছাড়াই যে পদ্ধতিতে শুধুমাত্র পলিনেশনের মাধ্যমেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব তাকে তুমি কেন প্রোমোট করবে না। আমরা যারা মৌমাছি পালন করি আমাদের জমি নেই। আমরা অন্যের জমিতে বসি। আমাদের দেশে জমির মালিক আমাদের ভাড়া করে নিয়ে যাওয়ার রীতি খুব একটা নেই। অন্যান্য দেশে হয়ত রয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে Practice টা খুব একটা হয়েছে এমন নয়। হিল এরিয়ায় কিছু কিছু হয় এই অব্দি। কিন্তু সমতলে অন্তত আমার সময় পর্যন্ত আমি দেখি নি। এখন যদি নতুন কিছু হয়ে থাকে।

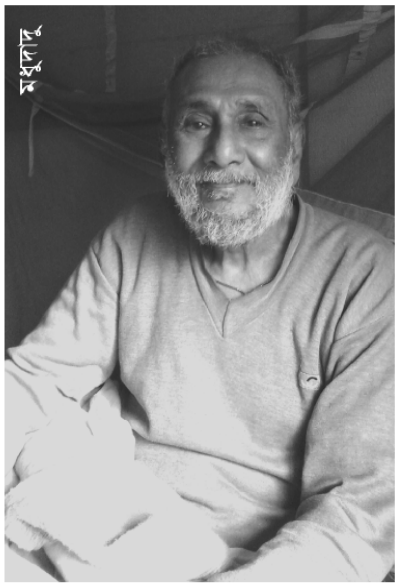

ভাড়া করে বলতে কি বোঝাচ্ছেন?

—যেমন ধরুন আমার মৌমাছির বাক্স আছে ১০০টা। আপনার ১০ একর জমি আছে। আমাকে বললেন আমার এই জায়গায় এসে মৌমাছি পালন করুন আসা-যাওয়ার, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। মধু যা হয় তা তুমি নিয়ে যাও।

আমাদের ওদিকে অনেকেই তো যায়...

—যায় এক জিনিস। আপনি ভাড়া করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেটা আরেক জিনিস। সেটা যায় অনুরোধে আপনার ওখানে আমি বসছি। আবার কোন কোন জায়গায় আপত্তি করে। বহু শিক্ষিত লোককে আমি বলতে শুনেছি, ওই মৌমাছি বসলে ওর ফুল কেটে দেবে।

মনে কিছু করবেন না, আপনাকে একটু থামাচ্ছি। যদিও অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের কথা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু কীভাবে কথাটা তুলবো বুঝে পাচ্ছি না... আসলে আপনাকে আমি মধুদাদু বলেই চিনি...

—ও বুঝেছি, ঠিকই তো দোষটা আমারই। আমাদের পরিচয় পর্বটা তো সারা হয়নি। আপনি ঘরে ঢোকা মাত্রই আমি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছি। এ ভারী অন্যায়। আসলে বয়সের দোষ... তাল কাটছে। যাইহোক আমার নাম শ্রী কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়। আমার বাড়ি বারুইপুর স্টেশনের কাছেই। বর্তমানে ওখানে সামান্য একটু জায়গা রয়েছে। ওখানে প্রায় এক একর জায়গা ছিল। কোনটা বিলিয়ে দিয়েছি, কোনটা বিক্রি করেছি, কোনটা আবার আরেকটা প্লট তৈরী করতে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে। এরকম করে-টরে একটা পুকুর, বাস্তবে লো-জমি রয়েছে একটা। তবে রেকর্ডে ওটা কিন্তু শালিজমি। তা আপনার নামটা?

সুদীপ্ত, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

—আপনি কি এখানকারই বাসিন্দা?

আমার জন্ম এখানেই।

—না, আমি বলতে চাচ্ছি আপনারা কি বংশানুক্রমিকই এ বঙ্গের?

বাবা এখানে এসে বসবাস শুরু করেন। তার আগে দিহিমদমল্লো বলে একটা জায়গায় থাকতেন। ওটা বারুইপুর থেকে ১ কি.মি. দূরে মল্লিকপুরের দিকে যেতে যে গ্রামটা পরে সেটাই। তার আগের খবর-টবর আমি জানি না। শুনলেও মনে নেই। আপনার পরিবার?

—আমার ২২ বছর বয়সে টি.বি. হওয়াতে ডাক্তার বলেছিল ৫০-র আগে আর বিয়ে-থা করো না। তাই আর বিয়ে করা হয় নি। তা আমার বাবা দু'বার বিয়ে করেন এবং দু'পক্ষে আঠারো জন সন্তানের জন্ম দেন। প্রথম পক্ষের ন'জনের মধ্যে আমি অষ্টম গর্ভ, বাকি সব মারা গেছে। পরের ন'জনের মধ্যে দু'জন ছোটবেলায় মারা যায়। ৭জন বড় হয়েছিল। ৩ বোন, ৪ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই এক বোন মারা গেছেন। তাদের পরিবার-টরিবার আছে। এক বোনের দূরে বিয়ে হয়েছিল।

এখন কি এখানেই থাকেন? এটা কি আপনারই বাড়ি?

—আপাতত এখানেই থাকি। আর আপনাকে যে ছেলেটি দিয়ে গেল বাড়িটা ওদের। ওর বাবা ৪০ বছর আগে আমার কাছে মাছ চাষ শিখেছিল। পরবর্তীকালে ওরা একটা দল তৈরী করেছিল। সে সময় প্রতি সন্ধ্যায় কাজের শেষে ওরা আমার বাড়ি আসত। সেই থেকে একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সম্পর্কটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ওদের আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে কোন অনুষ্ঠান থাকলেও এখন আমাকে যেতে হয়। আসলে আমি দেখলাম এ বয়সে তো আর নতুন কিছু করতে পারব না। তার ওপর বাড়ির যে অংশটায় মৌমাছি করতাম সেটাও যখন প্রমোটিং-এ যাবেই তখন আর কী করবো। টাকা-পয়সা দিয়ে ব্যবসা করবো তাও আর সম্ভব না। আর এ সব করেই বা কী করবো... খাই তো মোটে একবেলা। যদিও এই কথাটা আপেক্ষিক। আসলে ভাত খাওয়াটাকেই আমরা খাওয়া মনে করি তো তাই। আমি দেখেছি সারাদিন হালকা খেলে আমি ভালো থাকি। আর ফল-পাকড় জাতীয় জিনিস খাই বলে কোনদিন গরমের সময় এতো গরম লাগে না। শীত ও এতদিন বেশী লাগত না বটে তবে ইদানিং লাগতে আরম্ভ করেছে। বার্ধক্যকে এড়াই কী করে।

আপনার বয়স এখন কত?

—৮৮। যদিও কাগজে-কলমে আরো ছ'বছর পেছিয়ে আছি। কারণ আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশুনা করে বন্ধ করে দিই। তারপর রেলের চাকরিতে যোগ দিই। এরপর যখন টি.বি. হল আমার ভারী কাজ বন্ধ হয়ে গেল। রেলওয়ে আমাকে তখন চার ঘন্টার কোর্সে কাজ দিত। ফলে চার ঘন্টা কাজ করার পর আমার হাতে প্রচুর সময় কিন্তু কোন কাজ নেই... কী করবো? আবার নতুন করে পড়াশুনা আরম্ভ করি। ভবানীপুর টিউটোরিয়াল কলেজ থেকে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করি। ম্যাট্রিকের পর ইন্টারমিডিয়েটও পাশ করি। এরকম একটা সময়ে ছোট্ট একটা প্রমোশন পেয়ে আমাকে পাঠানো হল ওই যে জুট গোডাউনগুলো যেখানে ছিল... কী যেন জায়গাটার নাম... যাইহোক ওখান থেকে গেলাম হাওড়া। হাওড়াটা বড় খতরনাক জায়গা ছিল। ওখানকার ওয়াগনগুলোয় দামী দামী মাল আসত। আমরা যারা ওয়াচম্যান তারা যদি রাজী না হই তবে গুন্ডা-মাস্তানদের হাতে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। এমতবস্থায় বাড়ি ফিরে বাবাকে বললাম এ কাজ করা যাবে না। বাবাও দু'বার রেলে কাজ করেছিলেন। একবার যুদ্ধের আগে। আর একবার যুদ্ধের পরে।

আপনি কি ওয়াচম্যান ছিলেন?

—ওটা ছিল ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট। এখন যেটা আর. পি. এফ. আমাদের সময় সেটাই ছিল ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্ট। বাস্তবে আমরা ওয়াচম্যান হলেও আমাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত তাদের লাইটিং সেকশনেও কাজ করাত। প্রমোশনের পরে যখন বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাতে শুরু করলো তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এই সময়টা পড়াশুনা শুরু করি। শেষ পর্যন্ত যে ক'দিন বাইরে বাইরে আমার ডিউটি পড়লো সে ক'দিন আমি পড়াশুনো করার অজুহাত দিয়ে আর যাইনি। পরবর্তীকালে একটা দোকান করি বাড়িতেই।

আপনার জন্ম কবে?

—১৯২৮ সালের ২৮ আগস্ট। পরে যখন ম্যাট্রিক দেই তখন ২৯ বছর বয়স। তখন কথা উঠলো ২৯ বছরে ম্যাট্রিক পাশ করে কতদিন আর এই পাশের সুযোগ পাবো, মানে চাকরি। পড়াশুনো মানে যে আরো কিছু তখন আর এসব ভাবি নি। সে কারণে ছ'বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই বাস্তবে আমার যা বয়স তার থেকে রেকর্ডে ছ'বছর কমিয়ে পাবেন।

ওই যে দোকান করেছিলেন তারপর কী হল?

এরপর ওরা ডেকে পাঠালো তখন রেলওয়েতে আমার ১১ বছর হয়ে গেছে। ওরা ডেকেছিল কারণ তখন রেলের নিয়ম ছিল ১২ বছর চাকরি করে কেউ যদি চাকরি ছেড়ে দিত তবে তাকে পেনশন দিতে হবে। যেহেতু আমি টি. বি. থেকে সেরে উঠে কিছুদিন করে ছুটি নিয়ে পড়াশুনো করছিলাম। তাতে বোধহয় ওদেরও মনে হয়েছিল এ বান্দার কপালে রেলের ভাত নেই। আর ওদেরই বা দোষ কি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর '৫৬ সালেই মৌমাছিতে ঢুকে গেলাম। গান্ধী অ্যান্ড থট'র উদ্যোগে আমাদের ওখানে একটা কর্মশালা হল... আমি মৌমাছি পোষা শুরু করে দিলাম। তখন ২.৫০ টাকা দরে মধু উৎপাদকেরা মধু বিক্রি করত, আর আমরা ওটাকে খাদি কমিশনে নিয়ে গিয়ে ওদের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী ৫.২৫ টাকায় বিক্রি করতাম। তাতে যে মার্জিনটা থাকত, একবার এই করে ৫২৫ টাকার একটা চেক পেয়েছিলাম। তখন মানুষকে দেখাতাম মধু বিক্রি করে এত টাকার চেক পাওয়া যায়। এখন অবশ্য ৫ কোটি টাকার চেক কাউকে দেখালে গালে চড় মারবে। তখন যুগটাই অন্যরকম ছিল। সে সময় আমি ৩০টাকা পুঁজি করে একটা চায়ের দোকান করি। বাস্তবে অবশ্য চা আসতো বাড়ি থেকে। আর গ্রামে তখন চায়ের দোকান! কে খাবে? কিন্তু কপালে থাকলে যা হয় আর কি। সব ব্যাপারটাই আমার লেগে গেছে। এই যে এই জায়গাটা এখানেও কিন্তু মাছেরই কারবার। যে ছেলেটা আপনাকে দিয়ে গেল ও অ্যাকোয়ারিয়াম এক্সপার্ট। অ্যাকোয়ারিয়াম ফিশ তৈরী করে। তাছাড়া খাবার মাছ হিসেবে দেশী মাগুর, সরপুঁটি ব্রিড করে বিক্রি করে।

ওই ছেলেটির বাবাই তো আপনার বন্ধু, ওনার নাম কিন্তু জানা হয় নি।

—মৃদুল ঘোষ। প্রায় ২০০বিঘে জলে ও মাছচাষ করে। দিনে অন্তত ৪০-৫০ জন লোক ওর কাছে কাজ করে। বছরে কম করে ১০০টন মাছ সাপ্লাই দেয়। ও যে কত বড় একটা কাজ করছে... সেটা মাঝে মাঝে ওর ছেলেকে বলি। আজকে সারা দেশে, সারা পৃথিবীতে মানুষ যখন আমার আমার করছে, খালি দাও দাও করছে তখন ও যে কটা পয়সা পাচ্ছে সব ওদের পেছনে ঢালছে। এতগুলো লোক সেই কোন গ্রাম থেকে এসে এইখানে আছে। এরা যথেচ্ছ চুরি করে, মাছ খায়... এমনকি যে হোটেলে চা-বিস্কুট খায়... সেখানে চা-বিস্কুটের বদলে মাছ দিয়ে দেয়।

তাহলে আপনি কি চায়ের দোকানের সাথে সাথেই মাছচাষও শুরু করেছিলেন?

—তখন তো সামনের দিকে লিজ দিলাম। আর পেছনে নিজের জায়গায় পুকুর। খালি মাছ নয়। মাছ করলাম, হাঁস করলাম, মুরগী করলাম, গরু কিনলাম, ছাগল কিনলাম। আমার ৩০ টাকার ওপর একটা ফ্যাশিনেশন ছিল। এর আলাদা একটা গল্প আছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন লেবার ১টাকা। ভাবলাম আচ্ছা আমি যদি কোন একটা ব্যবসা করি এবং নিজেই খাটি তবে লেবার হিসেবে আমি ১ টাকা পাচ্ছি, ক্যাপিটাল যেহেতু আমার তাহলে সেখান থেকেও ১ টাকা আসছে, প্রোডাকশন হিসেবেও

যেটা বিক্রি হবে সেটা থেকেও ১ টাকা। তার মানে দাঁড়ালো মোট আয় ৩টাকা। এই ছিল আমার ৩০ টাকার গল্প। চায়ের দোকান থেকে মাছ, হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল... সবই আমি ৩০ টাকা দিয়ে শুরু করি। তারপর মুদিখানার দোকানও করি। মুদির দোকান করে কিছু ক্যাপিটাল হয়েছিল।

মৌমাছির ট্রেনিংটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন?

—নেহেরুর শাসনে ১৯৫২ সালে খাদি কমিশন সিদ্ধান্ত নিল, তারপরই বারুইপুরে এসে গেল। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম বাবা নিয়েছিল। আমার তখন টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। পরবর্তীকালে বাবার হাত কাঁপতে আরম্ভ করলো, তখন আমি নিলাম। বাবা ১টা দিয়ে শুরু করেছিল। আমি আরো দুটো নিলাম। ৩টে ৩০ টাকা। ৩০ টাকা কেন? কারণ ওগুলো ১৮ টাকা করে দাম পড়ত, আর ১০ টাকা করে দিতে হত আমাদের। ১৯৬৫ সালে খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে একটা সোসাইটি তৈরী করলাম। তার আগে ৬৪'র ডিসেম্বর থেকে ছ'মাস '৬৫-র মাঝামাঝি পর্যন্ত মৌ-পালনের ওপর একটা কোর্স করে এলাম। ইন্ডিয়ায় ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় কোর্স, অ্যাপ্রেন্টিস কোর্স। ট্রেনিংটা নিলাম ঠিকই আমি কিন্তু চাকরি করবো না, বললাম ওদের। ওরা তখন ওই কোর্সের জন্য চাকরি দিত। আর বাকি যারা ফিল্ডম্যান তাদের কোর্সটা ওরা চাইছিল তুলে দিতে। ওরা সেই সময় একটা পলিসি নেয়... যেহেতু ফিল্ডম্যানরা খাদির অধীনেই কাজ করছিল দীর্ঘদিন তারা যদি সেটা করে তবে একটা সময় যাবার পরে তারা বলতেই পারে এত বছর চাকরি করেছি আমি তোমাদের স্টাফ, কোর্টও মেনে নেবে। তাই খাদি করলো কি জেলাস্তরে একজন ছেলেকে পাশ করিয়ে ওই জেলায় একটা করে কোপারেটিভ সোসাইটি তৈরী করে দিল। ঠিক হল যেমন যেমন ওরা টাকা পাবে তেমনি স্কিম দেবে। স্কিম যে ক'বছর চলবে, চলবে... তারপর উঠে যাবে। এতে ওদের আর কোন দায় থাকবে না। বাস্তবেও তাই হল। টাকা-পয়সা পেয়ে যারা সোসাইটি চালাতে পেরেছে, চালিয়েছে। যারা পারেনি তারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যে ক'জন ছিলাম সততার সঙ্গে চালিয়েছি বলে চলেছে। কিন্তু আমার ট্রেনিং-এর পর যখন আমি নতুন করে কিছু করতে চাইলাম তখন বাধা আসতে আরম্ভ করলো। আমাকে যে পাঠিয়েছিল সে আমার জুনিয়র এখনও আছে, এখন সে সেক্রেটারী। পরবর্তীকালে সে আমারই তৈরী কাগজপত্র নিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আরো এগিয়ে গেল আর আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করলো। আমি বললাম, তবে তো আমি আর এখানে চাকরি করবো না। কারণ আমি তো তোমাদের মাইনে নিচ্ছি না। পরবর্তীকালে ৩ বছরে দেখা গেল নয়া পয়সার হিসাবে টাকায় ৪ নয়া করে Short হচ্ছে। এই Short মেকাপ হবে কী করে! কারণ তখন তো হাজার হাজার টাকার কারবার হচ্ছে। আমি যে মধু বিক্রি করতাম সেটা সোসাইটিকে দিয়ে দিলাম। আমার আয় তখন ফিশারি থেকে চলে আসতো।

পরবর্তীকালে ফিশারিতেও আবার সমস্যা দেখা দিল। বারুইপুরের পুকুর দুটো গুন্ডামী করে নিয়ে নিল। আমি দেখলাম গুন্ডা তো শুধু আর বারুইপুরে আছে তা নয়। যেখানে যাবো সেখানেই তো গুন্ডা আছে।

আচ্ছা রেলের চাকরিটার কী হল?

—ওটা '৬১তেই ছেড়েছিলাম। ছেড়েছিলাম তো আগেই, '৬১ সালে আর কি পাকাপাকি ছাড়লাম। রেল ৭০০ টাকা দিয়ে আমার পাওনা-গন্ডা চুকালো। সে টাকা আবার এক বন্ধুকে দিয়েছিলাম বাড়ির জায়গা কেনার জন্য। যদিও সেখানে সে কোনদিনই বাড়ি করে নি। পরে এসে ছ'মাস পর আমি যখন সোসাইটির ভার নিলাম ওই সময় আমি মৌমাছির বাক্স তৈরী আরম্ভ করলাম আমার আয়ের জন্য। বাক্স তৈরীতে খরচ হত ১৮ টাকা, আর বিক্রি করতাম ২০ টাকা করে।

আমার পড়াশুনা সেটাও ভারি মজার। টি. বি. থেকে সুস্থ হয়ে যখন রেলে জয়েন করলাম রেলেওয়েতে তখন আমাদের কাজটাকে বলা হত টি. সি.। অর্থাৎ ট্রেন যখন থামতো ট্রেনের আলো, ফ্যান সব আমাদের অফ্ করতে হত। এরকম একবার ভোরবেলা ডিউটি চলছে তো আমরা আলো অফ্ করতে করতে যেতাম আর দেখতাম শেষের দিককার কামরা থেকে প্রতিদিনই একদল মেয়ে হইহই করে নেমে কোথায় যেন যায়। একদিন হল কি একটা মেয়ে দৌড়ে যেতে যেতে আমাদের ভ্যানের সাথে এমনভাবে আটকে গেল যে শেষে মেয়েটাকে ছাড়াতে গিয়ে লোক পর্যন্ত জড়ো হয়ে গিয়েছিল। পরে আমার খেয়াল হল আরে এরা যায় কোথায়? তখন জানলাম ওরা কলেজে যায়। তারপর আমার মনে হল আরে এই মেয়েগুলো কলেজ করে আর আমি এখানে থেকেও কলেজে পড়ি না। তারপর সব জায়গা ঘুরে শেষে বঙ্গবাসী কলেজে গিয়ে বললাম, থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছি ভর্তি করবেন? আমার পরনে তখন হাফপ্যান্ট, হাফ শার্ট সারা শরীর জুড়ে ঘাম বেরোচ্ছে। একজন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফর্ম দিয়েও দিল। আমি ভর্তিও হয়ে গেলাম। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে আমার মনে হলো আরে দূর আমি হাঁস, মুরগী এসব নিয়ে কাজ করি আমার তো সায়েনস্ না পড়লে কোন লাভই নেই। ষাট সালের দিকে প্রি-ইউনিভার্সিটি সায়েনস্ এ গিয়ে ভর্তি হলাম। স্যার বললেন, ভর্তি তো তোমরা হচ্ছো, বসার কিন্তু জায়গা নেই। সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিন করার পর দেখলাম কিছুই বুঝি না। সবই ইংরেজিতে ক্লাস হয়। তারপর পুজার ছুটির পর আবার ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। ভাইস প্রিন্সিপাল একদিন ক্লাস নিচ্ছেন আমাদের। পড়া ধরলেন, আমরা কেউ কিছুই বলতে পারলাম না। উনি বললেন সে কি! তোমরা তো কেউ কিছুই বলতে পারছ না, তোমরা তো দেখছি কেউ পড়াশুনাই কর না। তখন আমি উঠে বললাম, কী পড়ব স্যার? এ্যাতো খটোমটো ইংরেজি, আমরা তো সব বাংলায় পড়ে এসেছি।

আপনি যা পড়ান সেসব তো কিছুই বুঝতে পারি না। আমি ভর্তি হয়েছিলাম, আমার হাঁস, মুরগী, ছাগল, গরু, মাছ, মৌমাছি আছে। আমি ওদের জন্যই সায়েনস্ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি বললেন, তুমি ইন্টারমিডিয়েটে আবার গিয়ে ভর্তি হও... পাশ করে এখানে এসো। স্যারের কথা অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলাম। '৬১ সালে আবার প্রাইমারী স্কুলের কোর্স চালু হল। বন্ধু-বান্ধবরা তখন পরামর্শ দিল—' দূর তুই এইসব কী ছাগল-গরু মিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস, তুই বরং গ্র্যাজুয়েট হয়ে যা। গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেলে দেখবি তুই দারুন সব কোর্সে চান্স পেয়ে যাবি। আর যা বয়স আছে তাতে ২০ বছর আরামে হেসেখেলে করে খেতে পারবি'। আমিও টোপ গিলে ফেললাম। এই করে আমার আর সায়েনস্ পড়া হল না। '৬৩টিতে বি. এ. পরীক্ষা দিলাম '৬৪তে রেজাল্ট বেরুল আমি ফেল করলাম। '৬৪টি-তে চলে গেলাম। '৬৫তে যখন ফিরে এলাম তখন টু-ইয়ার ডিগ্রি কোর্স শেষ হয়ে গেছে। '৬৬তে আবার গোড়া থেকে শুরু করলাম। এদিকে মৌমাছির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, সোসাইটি আরম্ভ হয়ে গেছে। রাতে পড়াশুনা করি, দিনে সোসাইটি চালাই। এই করে '৬৭ সালে ফের ফেল করলাম ইংরাজীতে। '৬৮তে গ্রাজুয়েট হয়ে পুরোপুরি লেগে পড়লাম মৌমাছি নিয়ে। কিন্তু তিন বছর পর ইলেকশনের আগে আগে আমি নতুন নতুন যা যা করতে চেয়েছিলাম সব বাধা পড়তে শুরু করলো। বিশেষ করে বাক্স তৈরীর ব্যাপারে। মৌমাছির বাক্সের কতগুলি নিয়ম আছে। যেমন ঢাকনা থাকবেই। দুপাশে কাঁচও দিতে পারেন, কাঠও দিতে পারেন। আমি দেখলাম যতদিন যাচ্ছে দামও বাড়ছে তত। সেই সময় ১৮ টাকার বাক্স তাও সব সেগুন কাঠ। আর এখন সেটা ৭০০-৮০০ টাকা দাঁড়িয়েছে। ২.৫০টাকার মধু এখন ২৫০ টাকা হয়েছে।

আমি বাক্সের দাম কমাবার জন্য আধ ইঞ্চি কাঠের ভেতর কাগজ ঢুকিয়ে কভার করলাম। আগে এক ইঞ্চি কাঠকে তিন 'জো' (তিন ভাগ) করতে হত। ফলে মজুরীও বেশী পড়ত, সেই সঙ্গে এক ইঞ্চির দামও দিতে হত। আমার পদ্ধতিতে দামও অনেক কমে গেল। কিন্তু ওরা আপত্তি তুললো... ওরা বললে একবারে ৬৬০০০ টাকার বাক্স তৈরী করা চলবে না। আমি বললাম কেন চলবে না? আমি পুণেতে দেখে এসেছি, তাহলে এখানে হবে না কেন? ওরা লেখলো পুণেকে। চিঠিচাপাটির পর ওরা মেনে নিল।

আপনি কি বি-কিপিং-র ট্রেনিংটা ওখানেই নিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, পুণের মহাবালেশ্বরে। '৬৪র ডিসেম্বর থেকে '৬৫র মে মাস, ওই ছ'মাস পর্যন্ত।

বি-কিপিং কোর্সটা কী ধরনের?

—ওই যে আপনাকে বলছিলাম সব থেকে বড় অ্যাপ্রেনটিস্ কোর্স, ওর থেকে বড় কোর্স আর নেই। পরে ওটাকে ৯ মাস করে দিয়েছিল। আগে কোর্সটা সকলেই করতে পারত। পরে শুধুমাত্র সায়েন্স'র যারা তারাই সুযোগ পেত। আগে টাকা দিত, পরে টাকা নিত। কিন্তু কোর্সটা চালাতে পারেনি বন্ধ হয়ে গেছে।

তাহলে মৌমাছি পালন ঠিক কত বছর ধরে করলেন?

—Still now I continue. ওই যে মনোজ পাঠিয়েছে আমাকে... ওকে দিয়ে যেমন করাচ্ছি। এখানে সুনীলবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন তাঁকে দিয়েও করাচ্ছি। আমার নিজের চাক নিয়ে আরকি। মনোজকেও প্রচুর ট্রেনিং-ফেনিং দিয়েছি। এখনও দরকার হলে গিয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দিই। তবে এখন ওরা অনেকটা শিখে গেছে।

মৌমাছি পালনকে ছড়িয়ে দেবার জন্য আপনি কি কোনও সংগঠন তৈরী করেছিলেন?

—হ্যাঁ, করেছি তো। আরে আমার শুরুই তো ওই সোসাইটি থেকে। সোসাইটিতে যেহেতু কমার্শিয়াল মেলিফেরা চাষ করা হত সেহেতু পরবর্তীকালে দেশী মৌমাছিকে রক্ষা করার জন্য আমরা দু-তিন জন মিলে 'ইউনিভার্সাল বি ক্লাব' নামে একট সংগঠন করি। ওতে এক লক্ষ টাকা পুঁজি করা আছে একটা ট্রাস্টের মত আর কি। তবে সবটাই মৌখিক, লিখিত কিছু নেই। বোঝেনই তো রেজিস্ট্রেশন করতে গেলেই অনেক ফেকরা। এখন আর যেহেতু আমরা ট্রেনিং দিতে পারি না, ওই টাকাটা আমরা একজন বা কোন একটা সংস্থা বি-কিপিং-এ আগ্রহী বা করছে তাদেরকে আমরা দিই। যেমন ওই মনোজকে দিয়েছি, রামকৃষ্ণ মিশন সারগাছিকে দিয়েছি। তারপর আমাদের ওই সোসাইটি তারাও পেয়েছে।

আচ্ছা গোবরডাঙাতে মৌ-পালকদের একটা বড় সংগঠন আছে না?

—হ্যাঁ, ওরাও করেছে। অনেকেই করেছে যে যার মত। ব্যক্তিগতও কেউ কেউ করেছে। আপনিও করতে পারেন। সংগঠন থাকলে প্রচারের কাজটা কিছুটা হলেও আগায়।

আমাদের কৃষির সাথে মৌ-পালনের প্রয়োজনীয়তা কতটা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

—১০০ শতাংশ প্রয়োজন রয়েছে। কৃষিকাজের সাথে সাথে মৌ-পালন করলে ২০-২৫ শতাংশ উৎপাদন বাড়বেই। এটা ধরুন Compulsory। বাই প্রোডাক্ট হিসেবে কিছু মধু তো পাওয়া যাবেই। মধুর সঙ্গে কতগুলো দামী প্রোডাক্টও পাওয়া যায়, যেমন পরাগ। ওটা ওষুধ, কসমেটিক তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এর ফুড ভ্যালুও মারাত্মক। আর 'রয়েল জেলি' বলে একটা সাংঘাতিক জিনিস পাওয়া যায়। 'রয়েল জেলি'র ক্ষমতা কতটা তাহলে সেটাই শোনায় আপনাকে। এমনিতে সমস্ত মৌমাছির বাচ্চাকেই মৌমাছিরা আড়াই দিন পর্যন্ত রয়েল জেলি খাওয়ায়। এবার আপনি যদি একটা আড়াই দিন বয়েসের যেকোন শ্রমিক মৌমাছিকে তুলে এনে কুইন ঘরে বসিয়ে ৬দিন ধরে 'রয়েল জেলি' খাওয়ান তবে সে কুইন হয়ে যাবে। আর কুইনকে যদি আড়াই দিন পরে শ্রমিক ঘরে বসিয়ে দেন সে শ্রমিক হয়ে যাবে। অর্থাৎ ওই 'রয়েল জেলি'র ভেতর এমন কিছু থাকে যার কারণে একই ডিম সে রাণী হবে কি শ্রমিক হবে সেটা সেই নির্ধারণ করে দেয়। এবং যাকে ব্যবহার করে মৌমাছিরা প্রয়োজন মতো নিজেদের মত তাদের

পরিবার... ঘর বড় বা ছোট করতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রেও আপনি যদি 'রয়েল জেলি' সরবতে মিশিয়ে কোন বুড়ো মানুষকে খাওয়ান তিনি অল্প সময়ের মধ্যে এনার্জেটিক হয়ে উঠবেন। বাচ্চাদের খাওয়ালেও তারা অনেক বেশী Speedy হয়ে যাবে। তারপর ধরুন পুরুষ মৌমাছি, আমরা বেশির ভাগ ড্রোনকেই সে কোন কাজ করে না বলে কেটে বাদ দিই। এই ড্রোনগুলোকে কেটে আপনি যদি মুরগীর বাচ্চাদের খাওয়ান তাহলে তারা খুব অল্প সময়েই ভালো গ্রোথ নিয়ে ম্যাকসিমাম ডিম দেবে। এছাড়াও রয়েছে বি-ভেনাম অর্থাৎ মৌমাছির বিষ। আমি নিজেই একটা রোগীকে সারিয়েছিলাম বি-ভেনাম দিয়ে। সে এখন এক ডাক্তার। তাঁরা তিন পুরুষের ডাক্তার। তা সেই ছেলেটার হয়েছিল স্কেলেরোসিস। সে ছেলেটির বাবা নিজে খোঁজ করে কোথায় মৌমাছির হুলে রোগ সেরেছে, সেই বই আনিয়েছিল। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে আমার কাছে এসেছিল। আমি প্রথমে দেখেছিলাম মৌমাছির বিষে ওর এলার্জি হয় কিনা। হয় নি। তখন আমি রেকমেন্ড করলাম হ্যাঁ এবার দেওয়া যেতে পারে। প্রথম ৫টা কি ৬টা পর্যন্ত কোন পয়জেন অ্যাকশন হয় না। তবে জ্বালা-যন্ত্রণা হয়। ভেষজ গুণের কাজ করে। ছ'মাস ধরে কতগুলো লাগান হয়েছিল মনে নেই, তবে ৬০০'র বেশি বি-স্টিং তাকে দেওয়া হয়েছিল। সেই ছেলেটির বিয়েতেও গিয়েছিলাম। উপহার দিয়েছিলাম মধু। পরবর্তীকালে যোগাযোগটা বন্ধ হয়ে যায়। ডা. এস. পি. সেন, ৩নং কলেজ রো।

রাসায়নিক কীটনাশকের ফলে মৌ-চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বা হচ্ছে সেটাকে কীভাবে আটকান সম্ভব?

—দু'ভাবে করা যেতে পারে। এমনভাবেই কীটনাশকগুলোকে তৈরী করতে হবে যেগুলো মৌমাছির কোন ক্ষতি করবে না। তাছাড়া দেখতে হবে কীটনাশকগুলোকে রাতে স্প্রে করা যায় কিনা।

আপনার কি মনে হয় না, রাসায়নিক কীটনাশকের বদলে জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা যেত।

—সে তো হচ্ছেই। এই যে আপনারা যারা করছেন তারা তো একদল করছেনই। আমার মূল বক্তব্য, আমি মনোজকেও এটা বলি। আপনারা তো গরীবলোক... আপনাদের টাকা-পয়সা নেই। যাদের টাকা নেই তারা বুক ফুলিয়ে এগোবে কী করে? তা আপনারা করছেন করুন। ক্ষমতায় যারা থাকে তাদের কথা... ওখানে দেখ তো কেষ্ট মুখুজ্জে একা লড়ছে, নাকি ও দল তৈরী করছে?—দাদা ও একা বলছে। —ও তাহলে ওকে বলতে দে, বলতে দে... ওকে একটা মাইক দে, যেই দেখবে যে দল তৈরী করেছে ওমনি আপনার ওপর যা যা নেমে আসবে আপনি ভাবতেও পারবেন না। আপনি একটা পকেটে করছেন, আপনি কতদূর এগোবেন? ওতে হবে না। ওদের ভেতরে আপনাদেরও ঢুকতে হবে। ভেতর থেকে পলিটিক্সটা না করতে পারলে কিচ্ছু হবে না। কোন লাভ নেই।

মৌচাষ কীভাবে বাড়ান যায় বলে আপনি মনে করেন?

—এটাই তো বলতে চাই। প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, সরকারের কাছে গিয়ে বলা যে তুমি এগ্রিকালচার, হর্টিকালচারে যারাই ঋণ নেবে বাধ্যতামূলক তাদের একর প্রতি চারটে করে মৌমাছির বাক্স বসাতে হবে। বাধ্যতামূলক কেন? না, এতে তোমার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আরো একটা কথা বলা দরকার এর সাথে লাভ বা লোকসানের কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। ফলে কৃষিকাজের সঙ্গে সহজেই আমাদের মত মানুষদের যুক্ত করে দেওয়া যাবে। দুজনে একসঙ্গে কাজ করে সহজেই এগিয়ে যাওয়া যাবে। আগে আপনি মৌমাছি ছাড়া কৃষিকাজ করতেন, আর আমি কৃষি ছাড়া মৌমাছি করতাম। সবাই একা একা, কীভাবে এগোন যাবে...! আরো একটা জিনিস আছে, সাংঘাতিক... আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আপনাকে বোধহয় ন্যানো চড়িয়ে দেওয়া যাবে। এটা ইনডিভিজুয়ালি করলেও চলবে। এর দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা মধুর হাইড্রোস্কোপিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কিছু করা। মধুকে যদি আপনি খোলা রেখে দেন তবে ও ধীরে ধীরে জল টেনে নিজে নিজেই কিছুটা বেড়ে যাবে। আপনি এবার মধুর মধ্যে কিছু ফল ঢুকিয়ে দিলেন ফলের জলটা ও টেনে নেবে। ফলে একই সাথে সংরক্ষণের কাজটাও হবে আবার আলাদা আলাদা ফলের গন্ধযুক্ত বাড়তি মধুও সহজে পাওয়া যাবে। ফল রপ্তানী করার ক্ষেত্রেও মধু এক দারুণ ভূমিকা নিতে পারে। যেমন ধরুন, এক কেজি আম বাইরে পাঠাবার প্লেন ভাড়া যেখানে ২০০ টাকা লাগবে। সেখানে আপনার ওই আমেরই ওজন মধুতে সংরক্ষণের কারণে কমে দাঁড়াবে ৩০০ গ্রাম ফলে আপনার পরিবহন খরচও অনেক কমে গেল। এর পাশাপাশি যেহেতু মধুতে সংরক্ষণ করেছেন সে কারণেও একটা ভ্যালু অ্যাড হবে এবং ওই ফলের দাম বেড়ে যাবে। এক মধুর ব্যবহার করে তিন ধরনের লাভ। এই হাইড্রোস্কোপিক পদ্ধতির সাহায্যে ইলিশের তেল পর্যন্ত বের করা যায়। যে তেল থেকে ওমেগা-3, ওমেগা-6 তৈরী হয়। যার একফোঁটার দামই আপনার কত। এগুলো সবই আমি করেছি কিন্তু মার্কেটিং করতে পারি নি। বি-কিপিং করতে গেলে প্রথমেই এর মার্কেটিংটা নিয়ে ভাবতে হবে। যেটা এখনও ঠিকঠাক আমাদের এখানে গড়ে ওঠেনি।

মধুমক্ষিকা ও কৃষক

মনোজ দাস

আসুন মৌমাছিদের নিয়ে গল্প করি। মৌমাছি নিয়ে কথা বলছি বলে মনে করবেন না আমি আমার পান্ডিত্য জাহির করতে চাইছি। বরং বলতে পারি এদের সম্পর্কে অনেক কিছুই আমার অজানা। আসলে এই ক্ষুদ্র পতঙ্গটি নিয়ে কথা বলতে আমি আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছি। পাশাপাশি এই সব ছোট্ট পাখাওয়ালা বন্ধুরা আমাদের জীবনে যে বিপুল সুফল বয়ে আনে তা দেখানোও আমার উদ্দেশ্য। মৌমাছিদের কাছে মানবজাতির যে ঋণ, তা স্বীকার করছি।

মৌমাছির সঙ্গে খুব ছোটবেলায় প্রথম কবে আলাপ হয়েছিল মনে করতে পারছি না। বাল্যের স্মৃতি হাঁতড়ে যেটুকু উদ্ধার করা গেছে তা হল—সুবর্ণরেখা ও ভুলুং নদী, বাঁশি খালের অববাহিকার পলি মাটি সমৃদ্ধ এলাকায় শীতের শেষের দিকে যখন আখ কাটা হত তখন আখের ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট মৌচাক হত। এই চাক তৈরী করত ছোট্ট ছোট্ট এক প্রকার মৌমাছি। চাকগুলোতে দেড়-দু'শ গ্রাম মত মধু হত। বড়রা সেই চাক থেকে মধু সংগ্রহ করত। সাধারণত সেই মধু সঙ্গে সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে নেওয়া হত। আমরা ছোটরাও একটু আধটু ভাগ পেতাম। যে আখ ক্ষেতের কাছ সরষের চাষ হত, সেই আখ ক্ষেতে বেশী মৌচাক পাওয়া যেত। এ গল্প আমার বাল্যের অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালের।

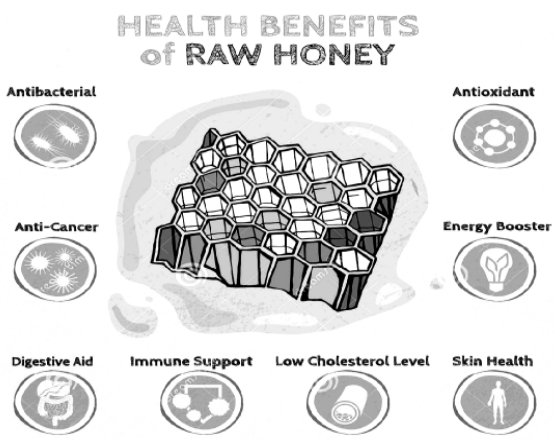

তখন ফাগুন মাস, সময় বেলা ১০টা-সাড়ে ১০টা। সালটা হবে ১৯৯৯। আমার বয়স ৩৫-৩৬ বছর। বড়দি স্বাস্থ্যকর্মী। হঠাৎ দেখি এক ঝাঁক মৌমাছির ভেতর দিয়ে আমাদের সাইকেল চলছে। প্রথমে দিদির গায়ে মৌমাছি বসে এবং হুল ফোটাতে শুরু করে। দিদি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আমি জোরে সাইকেল চালাতে থাকি। এবং দ্রুত অ-দূরের স্কুলে পৌঁছ যাই। দৌড়ে স্কুল ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ি। ইতিমধ্যেই দিদিকে গোটা দশেক মৌমাছি হুল ফুটিয়েছে। তার সহকর্মীরা তাকে হুলমুক্ত করে। সে যাত্রায় আমাকে কতগুলো মৌমাছি হুল ফুটিয়েছিল সেটা গণনা করা মুশকিল।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। ঘটনা চক্রে আজ থেকে বছর সাতেক আগে মধুদাদু অর্থাৎ কৃষ্ণদাস মুখার্জীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। উনি বারুইপুরের বাসিন্দা। কথা প্রসঙ্গে উনি বলেন, আপনি পরিবেশ নিয়ে কাজ করুন। হারিয়ে যেতে বসা মৌমাছিদের নিয়ে কিছু করবেন না? শুনে আমি চুপ করে থাকি। তার কিছুদিন পরে ইউনিভার্সাল বি-কিপারস্ সোসাইটির পক্ষ থেকে একটি মৌমাছি পালনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। আমাকে খবর দেন কিন্তু সেই সময় আমি বিশেষ কাজে বাইরে থাকায় ওই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে পারি না। তার বেশ কিছুদিন পরে আমার এক বন্ধু ধর্ম চ্যাটার্জীর বাড়ির ভেন্টিলেটারের মধ্যে একটি মৌচাক হয়েছিল। মধু দাদু তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেই মৌমাছিদের ধরে একটা বাক্সে ভরে দেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়ে আমার মৌমাছি পালন শুরু। আজ ৫ বছর ধরে আমি অ্যাপিস সেরেনা ইন্ডিকা সফলভাবে চাষ করে চলেছি। কৃষ্ণদাস মুখার্জী প্রবাদপ্রতীম মানুষ। তাঁর বর্তমান বয়স ৮৭ বছর। শিরদাঁড়া টানটান রেখে এখনও একা একা চারদিক চষে বেড়ান। মৌমাছি পালন এবং নিয়মিত মধু সেবনে যে দীর্ঘ সুস্থজীবন লাভ করা যায়—তার জীবন্ত উদাহরণ মধুদাদু। তাঁর কথা লেখার লোভ সংবরণ করে আসল কথায় আসা যাক।

মৌমাছিরা পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত। এরা ফুলের মধু বা মকরন্দ, পরাগ খেয়ে জীবন ধারণ করে। মৌমাছিরা গৃহী স্বভাবের। তাই এরা মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে সঞ্চয় করে রাখ। সেই সঞ্চয় সঙ্কটকালে ব্যবহার করে। ফুলের বৃতি ফুলকে ধরে রাখে। ফুলে থাকে দলমন্ডল বা পাপড়ি, পুংকেশর চক্র, গর্ভকেশর চক্র। মধু থাকে বৃতি ও দলমন্ডলের সংযোগস্থলে। এই মধু সংগ্রহ করার জন্য মৌমাছি যখন ফুলে বসে বা পরাগ সংগ্রহের জন্য ফুলে বসে তখন পরাগরেণু মৌমাছির পায়ে লাগে। এই অলিকুল যখন এক ফুল থেকে আর এক ফুলে উড়ে বেড়ায় তখনই পরাগ মিলন ঘটে। অর্থাৎ স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডের গর্ভকেশরের সঙ্গে পুংফুলের পুংকেশরের মিলন ঘটিয়ে ফল ফলাতে সাহায্য করে। অন্যভাবে বলা যায়, সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগ মিলনের জন্য মৌমাছির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই এই ক্ষুদে বন্ধুদের মৌমাছি বলে ডাকলে তার গুণের আংশিক স্বীকৃতি পায়। কিন্তু পরাগ মিলনকারীর ভূমিকার কথা উহ্য থেকে যায়। মৌমাছির এই উহ্য থাকা কাজটির গুরুত্ব একটু খতিয়ে দেখা যাক। এরা ১০০ গ্রাম মধু সংগ্রহ করতে ১০ লক্ষ বা তারও বেশি ফলে বসে। আমাদের দেশের সেরেনা ইন্ডিকা বছরে কমপক্ষে ২-৩ কেজি এবং সর্বাধিক ১৫-২০ কেজি মধু সঞ্চয় করে। আমরা ধরে নিতে পারি যতটা সঞ্চয় করে আরও ততটা পরিমাণ স্বপরিবারে খায়। এবার হিসেব করে দেখুন একটি মৌচাক থাকলে কী পরিমাণ পরাগ মিলন ঘটে এবং পরিপুষ্ট শস্য ও ফল উৎপাদিত হয়।

মানুষ আসার বহু আগে মৌমাছি এই পৃথিবীতে এসেছে। অনেক প্রজাতি পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। মৌমাছিকুল নিজেদের অভিযোজিত করে আজও টিকে আছে। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে, নগরায়নের ফলে পৃথিবী থেকে ক্রমশ বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে। কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি গত শতকের ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কৃষিতে

যথেচ্ছ কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মৌমাছি আজ বিপন্ন।

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণত তিন প্রজাতির মৌমাছি পাওয়া যায়। যথা ১. এপিস ডরসেটা বা রক বি বা জায়েন্ট বি কিম্বা ডাঁশ মাছি, ২. এপিস সেরেনা ইন্ডিকা, ৩. এপিস ফ্লোরিয়া বা ক্ষুদে মৌমাছি। তাছাড়াও হুলহীন ক্ষুদে মাছি, এপিস ম্যালিফেরা বা ইটালিন মৌমাছি।

উপরিউক্ত মৌমাছিগুলির মধ্যে এপিস সেরেনা ইন্ডিকা চাষবাস করার পাশাপাশি পালন করা যায়। তাতে ফলন বাড়ে আবার মধুও পাওয়া যায়। কিন্তু ম্যালিফেরা চাষ করলে পুরো সময়ের জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে। ফলে চাষ করা যাবে না।

এবার আসি মধুর কথায়—মধুতে থাকে গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, মলটোজ, ভিটামিন, মিনারেলস ইত্যাদি। মধু হজম করতে লাগে না। মধু প্রতিদিন একটু করে খাওয়া স্বাস্থের পক্ষে ভালো। আমাদের দেশের মেয়েরা জৈবিক কারণে রক্তাল্পতায় ভোগেন। তাদের নিয়মিত মধু খাওয়া উচিত। বয়স্ক লোকেদের হজম করার শক্তি কমে যায়। তারা নিয়মিত মধু খেতে পারেন। মধু দ্রুত ক্যালরি যোগান দিতে পারে। তাই অ্যাথলিটরা মধু খেয়ে ভালো ফল পেতে পারেন। কথিত আছে, কেউ যদি তার বাচ্চাকে এক বছর বয়সের পর থেকে টানা পাঁচ বছর শুধু মধু খাইয়ে তার মিষ্টির চাহিদা পূরণ করেন, তবে সেই বাচ্চা সারাজীবন সুস্থ থাকতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে মৌমাছিপালকরা সুস্থ জীবনের অধিকারী হন।

এইসব জানার পর কি মৌমাছি ছাড়া পৃথিবীর বুকে গাছপালার অস্তিত্ব মায় মানুষে অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়? আসুন না ক্ষুদে বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশে, আমাদের উত্তরসূরীদের কথা মাথায় রেখে মৌমাছিদের প্রতি যত্নশীল হই। কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার বর্জন করি।

সিকিমের মত ছোট রাজ্য যদি রাসায়নিকমুক্ত কৃষিব্যবস্থা চালু করতে পারে, কেন্দ্রীয় সরকার কেন গোটা দেশে জৈব কৃষিব্যবস্থাকে চালু করা বাধ্যতামূলক করছে না?

কৃষিতে অত্যাধিক নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের কারণে কোলোন, অগ্ন্যাশয় এবং লিভার ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য অসুখে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি প্রতিদিন।

কৃষিতে নয়া সংকট ... কীটনাশকের কারণে পরাগ সংযোগকারী মৌমাছির মৃত্যু

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের সেন্টার ফর পলিনেশন স্টাডিজের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিভিন্ন পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচাতে চাষের ক্ষেতে যেভাবে ঢালাও কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে তাতে মৌমাছির মত বন্ধু পতঙ্গও কাবু হয়ে পড়ছে। তাদের ঘ্রাণশক্তি, ওড়ার ক্ষমতা কমছে। অনেক মৌমাছি মারাও যাচ্ছে। ফলে যে সব ফসলে বাহকনির্ভর পরাগমিলন জরুরি তার ফলন মার খাচ্ছে। ''কীটনাশকের প্রভাবে মৌমাছি-সহ অন্যান্য পরাগসংযোগকারী পতঙ্গের সংখ্যা কমছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, দুই চব্বিশ পরগণায় কীটনাশকের সংস্পর্শে অনেক ক্ষেত্রে মৌমাছিরাও মারা যাচ্ছে''—বলেছেন সেন্টারের অধিকর্তা অধ্যাপক পার্থিব বসু। তাঁর পর্যবেক্ষণ, নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য যতটা পরাগসংযোগ দরকার মৌমাছির সংখ্যা কমে যাওয়ায় ততটা হচ্ছে না। সে কারণে ফলনে ব্যাঘাত ঘটছে।

কুমড়ো, লাউ, শসা, বেগুন, আপেল, কমলালেবুর মত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুরুষ-ফুলের পরাগ স্ত্রী-ফুলের গর্ভমুন্ডে পড়ে পরাগমিলন ঘটে। বীজ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এ ক্ষেত্রে পরাগমিলন ঘটায় মৌমাছি। পরাগমিলনের দরুন বীজের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়ে। ফল ধরার হার বৃদ্ধি পায়। ফল ঝরা বন্ধ হয়। রোগ ও পোকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তিও বাড়ে। এমনকি মৌমাছির মাধ্যমে নিষেকের ফলে গড় ফলন সাধারণত ১৫-২০ শতাংশ বেড়ে যায়। কিন্তু কীটনাশকের কারণে মূলতঃ অর্গানোফসফরাস (ডাইমিথোইট), সাইপারমেট্রিন ও অর্গানোক্লোরিন (এন্ডোসালফান) জাতীয় কীটনাশকের ব্যবহারে এপিস সেরেনা ইন্ডিকা প্রজাতির ভারতীয় মৌমাছি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মৌমাছিপালক সমবায় সমিতির ডিরেক্টর প্রণবকুমার রাজের আক্ষেপ—''কীটনাশকের কারণে মৌমাছিগুলো অকালে মরছে। বংশবিস্তার করতে পারছে না। কৃষি, দফতরকে বারবার বলেছি, চাষে কীটনাশক কমানো হোক। কিছুই হয় নি। দুই চব্বিশ পরগণায় প্রচুর মানুষ মৌমাছি পালন করেন, যাদের সংসার চলে মধু বেচে। তারাও সঙ্কটে। দশবছর আগে দু'জেলায় মৌমাছিপালক ছিলেন হাজার দেড়েক। এখন মেরে-কেটে পাঁচশোও হবে না''।

সমস্যাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের নয়, সারা বিশ্বের মৌ-পালকদেরই এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। খোদ আমেরিকায় ২০১৫'র সেপ্টেম্বরে আমেরিকার কৃষি দপ্তর ও সেখানকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের অর্থানুকূল্যে 'বি ইনফর্মড পার্টনারশিপ' আমেরিকার ৬০০০ মৌ-পালকের উপর সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয় এপ্রিল ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৫-র মধ্যে উত্তর আমেরিকার মৌ-পালকদের পালন করা প্রায় অর্ধেক (৪৮ শতাংশ) মৌমাছি মারা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার মৌ-পালকেরা হারায় ৩৭ শতাংশ মৌ-কলোনী। একই ঘটনা ঘটেছে কানাডায়। কানাডাতেও খাদ্যশৃঙ্খল এবং বাস্তুতন্ত্রের মূল জায়গা দখল করে আছে মৌমাছি। কীটনাশকের কারণে সেখানেও এক ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ মৌমাছি মারা গেছে। কানাডার ওনটারিও বি কিপার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইউনাইটেড চার্চ অফ কানাডা, সিয়ারা ক্লাব অফ কানাডা এবং কানাডার অন্যান্য সংস্থা সকলেই চাষে কীটনাশকের ব্যবহার বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন।

COLONY COLLAPSE DISORDER (CCD)

- **CAUSAL ORGANISM**- stresses, malnutrition, pathogens and genetically modified (GM)crops
- **PLACE OF INFECTION** - colony
- **SYMPTOM**–worker bees from a beehive colony abruptly disappear
- **STAGE INFECTED – worker bees**
- **MANAGEMENT** – Exact causes are not known so following natural beekeeping practices.

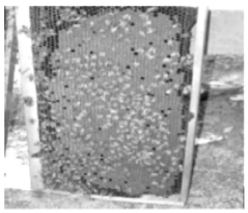

সারা পৃথিবীব্যাপী ক্রমাগত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের ওপর তার কী ধরণের প্রভাব পড়ে তা WIA-র গবেষকদের গবেষণায়. নিওনিকোটিনয়েডস্‌কেই মূলত কৃষি ক্ষেত্রের দূষণের জন্য দায়ী করা হয়েছে। মূলত এই কীটনাশকের কারণে মেরুদন্ডহীন জীব থেকে বিভিন্ন জলচর প্রাণী এবং সামুদ্রিক ও জলের তলায় বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদেরা আক্রান্ত হয়। নিওনিস, মৌমাছি এবং বিভিন্ন পরাগসংযোগকারী পতঙ্গদের পাশাপাশি কেঁচো ও শামুকদেরও (যারা মাটির উর্বরতা বাড়ায়) মৃত্যু ঘটায়। নিওনিকোটিনয়েডস্ এতটাই মারাত্মক যে বীজের মধ্যে এই রাসায়নিকটি থাকলে তা গাছের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে গাছের বিভিন্ন অংশের কলা-কোষে যেমন, পাতা, ফুল, মূল, কান্ড এমনকি পরাগ এবং ফুলের মধুতেও পৌঁছে যায়, যা বিষ হিসেবে অনেক সপ্তাহ ধরে সক্রিয় থাকে। মূলতঃ জাব পোকা, শেকড় আক্রমণকারী পোকা এবং অন্যান্য পোকামাকড়কে আটকানোর জন্যই এই কীটনাশক ব্যবহৃত হয়। এই কীটনাশক পোকাদের স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে পোকাদের মৃত্যু ঘটায়। কানাডার বিভিন্ন মৌ-পালক সংস্থার পক্ষ থেকে এই কীটনাশকটিকে নিষিদ্ধ করার দাবী উঠেছে।

গবেষকদের বক্তব্য—ইমিডাক্লোপ্রাইড (এক ধরনের নিওনিক যা সারা বিশ্বে কীটনাশক হিসেবে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়) এবং ফিপরোনিল (একটি কীটনাশক যা ফেনিলপারাজোল গ্রুপের মধ্যে পড়ে)

এই দুটি কীটনাশকই অনেক পাখি এবং বেশিরভাগ মাছের ক্ষেত্রেই মারাত্মক ক্ষতিকারক।

তারা এই ইমিডাক্লোপ্রাইড, ফিপরোনিল এবং ক্লোথিয়ানিডিন (একটি নিওনিস) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই সবের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না ঘটলেও মাছ এবং পাখিদের ক্ষেত্রে নানান ক্ষতিকারক প্রভাব দেখা যায় যেমন, জেনোটক্সিক, সাইটোটক্সিক প্রভাব ইত্যাদি। ইমিডাক্লোপ্রাইড এবং ক্লোথিয়ানিডিন বীজের মাধ্যমে পাখিদের শরীরে প্রবেশ করলে তাদের বৃদ্ধি এবং প্রজনন ক্রিয়ায় খারাপ প্রভাব পড়ে।

২০১৪-তে কানাডার মৌ-পালকরা কীটনাশক প্রস্তুতকারক সংস্থা বায়ার ও সিনজেন্টার বিরুদ্ধে ২০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবী করে আদালতে গেছে। ২০১৩ সালে কানাডার স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে একটি সরকারী স্বাস্থ্য সংস্থা ৭০ শতাংশ মৃত মৌমাছিদের শরীরেই ওই কীটনাশক পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৌমাছি মৃত্যুর ঘটনাগুলো ভূ'টা ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘটেছিল।

WIA -র রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর নিউইয়র্কের একটি আইনি সংস্থা ন্যাচরাল রিসোর্সেস ডিফেন্স কাউন্সিল(NRDC), ইউ এস এনভাইরনমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি-র (EPA) সাথে যৌথভাবে নিয়োনিসেস্-এর অনুমোদন বাতির করার জন্য একটি পিটিশন দাখিল করে। পিটিশনে বলা হয়, 'নিওনিকোটিনয়েড যে মৌমাছিদের ওপর বিষক্রিয়া ঘটায় তার বিস্তর প্রমাণ রয়েছে। ইপিএ-র উচিত এর সহজলভ্য এবং নিরাপদ বিকল্প প্রোডাক্টের ব্যবস্থা করা। মধ্যবর্তী সময়কালে মৌমাছির সুরক্ষার জন্য দ্রুত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। অন্ততঃ প্রশাসনিক মূল্যায়ণ করা খুবই প্রয়োজনীয়।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর মতো, কবে আমাদের সংবিধানেও 'প্রকৃতির অধিকার' একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পাবে?

আধুনিক কৃষি ও অণুখাদ্য - জনস্বাস্থ্যের অবনমন

সুদেব সাহা

খাদ্য মানে তো শুধু শক্তি উৎপাদনকারী এবং দেহগঠনকারী পুষ্টি উপাদান নয়, এর সাথে রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিরোধী বিভিন্ন অজৈব খনিজ লবণ, ভিটামিন এবং বহু সংখ্যক ফাইটো-কেমিক্যাল (বিশেষতঃ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট) উদ্ভিদ, পরিবেশ থেকে সংগৃহীত উপাদান নিয়ে এ-সবই নিজের শরীরে সংশ্লেষিত করে এবং শুধু যে নিজের বৃদ্ধিবিকাশ ঘটায় তাই নয়, উপাদানগুলোকে খাদ্যে অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং খাদ্যশৃঙ্খলাকে পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ করে। প্রযুক্তি নির্ভর রাসায়নিক কৃষিব্যবস্থা যদি পরিবেশে প্রয়োজনীয় উপাদানের ভারসাম্য পালটে দেয়, তাহলে খাদ্য শৃঙ্খলের পথ বেয়ে আমাদের শরীরেও পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে হাজারো রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

পৃথিবীর সব জায়গায় এখন কমবেশি খাদ্যে অনুখাদ্যের পরিমাণ কমছে। খাদ্যে শক্তি উৎপাদনকারী কার্বো হাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাট ছাড়া যে খনিজ লবণ ও জৈব যৌগগুলো সামান্য পরিমাণ হলেও আমাদের শরীরে শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেগুলোই অণুখাদ্য।

খনিজ পদার্থের মধ্যে মূলতঃ আয়রণ, জিঙ্ক, কপার, আয়োডিন, ম্যাঙ্গানিজ, বোরোন, মলিবডেনম, নিকেল, কোবাল্ট, সেলেনিয়াম অল্প পরিমাণে (দৈনিক ১০০ গ্রা. এর নীচে) খুবই প্রয়োজন এবং জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জৈব যৌগের মধ্যে অল্প পরিমাণ হলেও বিশেষ প্রয়োজন ১০টি জলে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং ৪টি ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন। এছাড়াও খাদ্যে রয়েছে অল্প পরিমাণে অসংখ্য জৈব যৌগ যা আমাদের শরীরকে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। এই যৌগগুলোই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক সমীক্ষা বলছে, পৃথিবীতে কৃষি জমির ১/২ অংশে জিঙ্ক, ১/৩ অংশে বোরেন, ৪০% অংশে কপার, মলিবডেনম, ম্যাঙ্গানীজ অনেকটাই কমে গেছে। কৃষিজমিতে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের পরিমাণ গড়ে ১/৮ ভাগ কমেছে। প্রযুক্তিনির্ভর রাসায়নিক চাষ করার ফলে মাটিতে অনুজীবের সংখ্যা কমে যায়। ফলে অণুজীবের সক্রিয়তায় বায়োমাস বিয়োজনের ফলে মৌলগুলো পুনরায় মাটিতে ফিরে আসতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ মৌলগুলো মাটিতে কমে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ হল, একই ধরণের উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদিত হওয়ার জন্য বেশী পরিমাণ মৌল মাটি থেকে নিংড়ে নেওয়া হয় অথচ সংযোজিত হয় তুলনায় অল্প পরিমাণ। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে মাটির অম্লত্ব-ক্ষারত্বের ভারসাম্যের হেরফের হয়। নির্দিষ্ট PH 5.5-7 এ উদ্ভিদ বেশী পরিমাণ মৌল (ক্যাটায়ণ) শোষণ করতে পারে। PH 5.5 এর নীচে অর্থাৎ মাটির অম্লত্ব বাড়লে উদ্ভিদের মূলত্বকের কোষে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়ন মাটির ক্যাটায়ণ শোষণে বাধা দেয়। এছাড়া মাটিতে কাদার ভাগ বেশী থাকলে মৌলগুলোকে ধরে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়। ফলে উদ্ভিদের মূলরোমের কাছে মৌলের ঘনত্ব বেড়ে যায় অর্থাৎ কাদার পরিমাণ কমলে ক্যাটায়ণ শোষণের মাত্রাও কমে যায়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ, অণুখাদ্যে অপুষ্টির সংখ্যা গোটা পৃথিবীতে ৫ বিলিয়নের বেশী। এই অপুষ্টির পোষাকী নাম মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট ম্যাল নিউট্রিশন। শুধুমাত্র আয়রনের ফলে রক্তাল্পতার সংখ্যা প্রায় ২ বিলিয়ন এবং আয়োডিন স্বল্পতাজনিত অসুস্থ মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ বিলিয়ন। ১ - ৫ বছর বয়সের মধ্যে ৩৫% শিশু জিঙ্ক এবং আয়রন স্বল্পতায় ভুগছে। ৫ বছর বয়সী শিশুদের ১৯% মৃত্যুর কারণ ভিটামিন 'এ', জিঙ্ক, আয়রন এবং আয়োডিন এর স্বল্পতা।

এ চিত্র কমবেশী পৃথিবীর সর্বত্র। নোবেলজয়ী রসায়নবিদ ডাঃ লাইনাস পাওলি বলেছেন, "You can trace every sickness, every disease and every ailment to a mineral deficiency."। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রতিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে কৃষিজমিতে, খাদ্যে এমনকি মৌলের ঘাটতিজনিত রোগের ঝুঁকি আছে সে সব মানুষকেও বিভিন্ন খনিজদ্রব্য প্রয়োগ করার সুপারিশ করছেন।

Micro –nutrients amount In soil

Micro –nutrients	Range	Average
Fe	0.5 – 50%	3 – 4%
Mn	20 – 3,000 ppm	600 ppm
Cu	2 – 100 ppm	9 ppm
Zn	10 – 300 ppm	50 ppm
B	2 – 200 ppm	50 ppm
Cl	1-100ppm	50ppm
Mo	0.2 – 5.0 ppm	1.2 ppm
Ni	2 – 750 ppm	50 ppm

শ্বেতসার, প্রোটিন ও চর্বিজাতীয় পদার্থের বাইরে উদ্ভিদ প্রায় ৫০ হাজার জৈব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষিত করে, যাকে secondary plant metabolite বলা হয়। এ সব জৈব যৌগ মানুষের শরীরে কি কি কাজ করে তা এখনও বেশির ভাগই অজানা। তবে বেশ কিছু যৌগ আমাদের শরীরে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, যৌগগুলো ভিটামিন নামে পরিচিত। এছাড়াও বহু সংখ্যক জৈব রাসায়নিক পদার্থ অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কাজ করে। খাদ্যে ভিটামিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণ নির্ভর করে কতকগুলো বিষয়ের ওপর, যেমন— ১. কৃষি পদ্ধতি ২. শত্রু পোকার চাপ ৩. শত্রু পোকা দমনের পদ্ধতি ৪. জমির উর্বরতা ৫. আবহাওয়া ৬. উদ্ভিদের জীন বিন্যাস। প্রথম চারটি বিষয় অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পুষ্টিবিদ ব্রান্ডেট এক গবেষণাপত্রে বলেছেন, "We will dare to estimate levels of plants defense releated secondary metabolites in organic vegetables to be 10-50% higher than in conventional ones. The

differences are probably small in fruits."

নিউজিল্যান্ড, জাপানের সমীক্ষা বলছে, জৈবচাষে খাদ্যে ভিটামিন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত খাদ্যের চেয়ে ৩০% থেকে ১০ গুণ বেশি। উদ্ভিদ বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, রোগপোকার আক্রমণ, আঘাতজনিত ক্ষত বা অন্য কোন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শরীরে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে অথবা ক্ষতস্থান সারায়। তাই খোসার ঠিক নীচে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট (ফ্ল্যাভোনয়েড বা ফেনোলিক অ্যাসিড) বেশী পরিমাণে জমা হয়। আলোর সংস্পর্শে থাকা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি বেশী সংশ্লেষিত হয়। এছাড়াও একই প্রজাতির বড় ফলের তুলনায় ছোটো ফলে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশী, কারণ ছোট ফলের ওজনের অনুপাতে বাইরের ত্বকের আয়তন বেশী। রোগপোকার আক্রমণ বা জীবাণুশূন্য পরিবেশে উদ্ভিদ শরীরে এই রাসায়নিক পদার্থ তুলনায় কম সংশ্লেষিত হয়। এছাড়া সংকর উচ্চ ফলনশীল বীজে প্রাথমিকভাবে বেশী পরিমাণ দানাশস্য উৎপন্ন হয় অথবা সংকর পদ্ধতিতে বড় বড় সবজি ও ফল উৎপন্ন হয়। তার ফলে খাদ্যবস্তুর ওজন অনুপাতে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পরিমাণ কমে যায়। এককথায় একে আমরা "Dilution effect" বলতে পারি। আমাদের শরীরে গৃহীত খাদ্যবস্তু থেকে বিভিন্ন বিপাকীয় পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের সময় কোষে কোষে প্রচুর পরিমাণে 'Free Radical' (অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন মূলক) তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী হয়। এই মূলকগুলির বাইরের কক্ষে মুক্ত ইলেকট্রন থাকার ফলে কোষের যে কোন জৈব অণু থেকে একটি ইলেকট্রন চুরি করে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ইলেকট্রনের ঘাটতি জৈব অণুগুলোকে (এমনকি DNA অণু) অস্থির করে তোলে, শুরু হয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া। ফলে কোষের বহুস্তরীয় ক্ষতিসাধন ঘটে এবং বিভিন্ন মারাত্মক রোগের কারণ ঘটায়। কিন্তু শরীরে উৎপাদিত 'Free Radical' নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমাদের শরীরের ভেতরে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যথেষ্ট নয়। খাদ্যবস্তুর ভেতরে থাকা বিভিন্ন ফাইটো-কেমিক্যাল 'Free Radical' নির্মূলকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। গোটা পৃথিবীতে অসংক্রামক রোগ দ্রুত বেড়ে চলেছে। যদিও উন্নয়ণশীল দেশগুলোতে এই সংখ্যাটা ৬০% এর বেশী। নিরাপদ, অণুখাদ্য সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবারের অভাব অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন (A, C, E অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে) ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস-এর অভাব ক্যানসার, কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ, হাইপারটেনশন, বিভিন্ন নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ, ডায়াবিটিস প্রভৃতি অসুখের সম্ভাবনা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়।

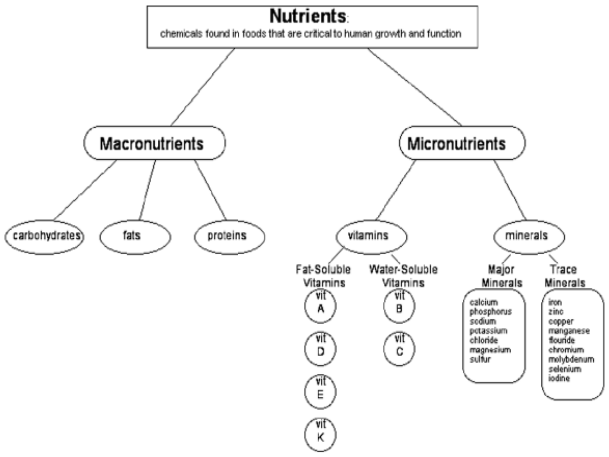

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তুলনায় রাসায়নিক মুক্ত পরিবেশে জৈব পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করে বিভিন্ন দানাশস্য, ফল, শাকসব্জির পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত খাদ্যে আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টস (ক্যারোটিনয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যাকাল্কোসায়ানিন)-এর পরিমাণ অনেক বেশী। উদাহরণ হিসেবে ক্যালির্ফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনবছর এবং দশ বছরের টমাটো নিয়ে গবেষণার কথা বলা যায়। সেখানে রাসায়নিক থেকে জৈব পদ্ধতিতে ফিরে আসার তিন বছরের মধ্যে ভিটামিন সি ২৬% অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্ল্যাভোনয়েড(ক্যুয়েরসেটিন ৩০% এবং ক্যাম্পফেরল ১৭%) বেড়ে গেছে। দশ বছরের টম্যাটো নিয়ে গবেষণার ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে, ক্যুয়েরসেটিন ৭৯% এবং ক্যাম্পফেরল ৯৭% বেড়ে গেছে। অর্থাৎ জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজে সময়ের সাথে সাথেই মাটি উর্বর হয়ে ওঠে এবং খাদ্যে পুষ্টিগুণ বেড়ে যায়।

আধুনিক কৃষিব্যবস্থা মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির অছিলায় প্রাকৃতিক সম্পদ নিষ্কাশিত করে বড় বড় কৃষি ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে, ফসল বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে, পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ বেড়ে যাচ্ছে এবং নিরাপদ অনুখাদ্য সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। ফলে, বিশ্ব জুড়ে জনস্বাস্থ্যের সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য কর্মীরা মানুষের স্বাস্থ্যের দায় কৃষি ব্যবসায়ীদের হাতে সমর্পণ করে, মুনাফার সামনে নতজানু হয়ে, কতগুলো বাছাই করা সংক্রামক রোগব্যধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে, জনস্বাস্থ্যের জয়গান গাইছে।

খাবার নিয়ে ভাবার আছে

অনুপম পাল

বিজ্ঞাপনী খাবার ঃ

ডাক্তারবাবু দেখুন না ছেলে তো কিছুই খাচ্ছে না, খালি চিপস্, কোল্ড ড্রিংকস খেতে চায়। মাছ, শাকসবজি একদম ছোঁয় না। ওকে কি মেমোরি চার্জার দেব না টলার-স্ট্রংগার-স্মার্টার হওয়ার পানীয় দেব? জনৈক মা চার বছরের ছেলের জন্য শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে জানতে চাইছেন। আসলে মায়েদের কী দোষ? সারাদিন টিভিতে ও সংবাদপত্রে ওই সব পানীয় ও খাবারের জনমোহিনী বিজ্ঞাপন দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞাপন দেখানো হয় ২ মিনিটে অন্তত চারবার যাতে কেউ ভুলে না যায়। তাছাড়া দুটো কিনলে একটা ফ্রি, কারুর সঙ্গে বাচ্চাদের খেলনা, কার্টুন ইত্যাদি। আমরা গদগদ হয়ে কিনি। কোনটায় আবার অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম আছে, কোনটায় ২৩টা বা তার বেশী খাদ্যপ্রাণ আছে। প্রচারের মাধ্যমে কিছু পানীয়ের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরী হয় কম্প্যুটার ইঞ্জিনিয়ার, অংকে ভালো হবার। ভাগ্যিস এখন মুদির দোকানে ইঞ্জিনিয়ার বা বৈজ্ঞানিক হওয়ার ফর্মটা দেয় না। লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক পানীয় আছে। মেয়েদের জন্য একরকম, বৃদ্ধদের এবং বাচ্চাদের জন্য আলাদা আলাদা পানীয় আছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনের আরো চটক আছে। কোন একটি স্কুলে ৮৭৬ জন বাচ্চাকে বিশেষ পানীয় খাইয়ে ১০ মাস পরে দেখা গেল তাদের উচ্চতা ৪ ফুট ২ ইঞ্চি থেকে বেড়ে ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলা হচ্ছে দ্বিগুণ। ভাবুন অঙ্কের হিসাব। শিশুরা এখন এমনি এমনি বাড়বে না। স্কুলে এক শিশু তার বন্ধুকে টিফিনের সময় বলছে ''তোর মা তোকে বাজে হেলথ ড্রিংকস্ দেয়, আমারটা—কিনে দিতে বল।'' প্রাকৃতিক সব খাবার সরিয়ে দিয়ে কোন এক শিশুর নতুন করে জন্মদিন হয় হেলথ ড্রিংকস দিয়ে। মায়ের বক্তব্য তাই। দুধের কোন অংশেই ওই সব পানীয় পুষ্টিকর নয়, বাচ্চাদের বৃদ্ধির সময় সব ধরনের উপাদানই আছে। তবে ওই পানীয়ের সঙ্গে কোকো, চিনি ইত্যাদি মিশিয়ে স্বাদ ভালো করা হয়েছে। দুধের বিকল্পও হেলথ ড্রিঙ্কস নয়। কিছু ক্ষেত্রে দুধে অবশ্য আলার্জী দেখা দেয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে। সুতরাং কে আর অত কথায় যায়। রিস্ক বা নেয় কীভাবে বিশেষত যে সমস্ত মায়েরা সন্তানের ''বৃদ্ধি ও টলার-স্ট্রংগার'' হওয়ার ব্যাপারে কোন আপোস করেন না। কি নেই খাবারের তালিকায় ঠান্ডা পানীয়, দিল মাঙ্গে মোর, আমের স্বাদে ভরা পানীয়, প্যারাশুট থেকে পড়ার জন্য পানীয়, পড়ন্ত অবস্থায়ও পান করা যায়, মাছ ধরার জন্য বিস্কুট, বিস্কুট ভাঙার আওয়াজে চশমার কাঁচ ভেঙে যায়, খেলোয়াড়দের শক্তি বর্ধনের গোপন রহস্য হল এক বিশেষ পানীয়, উন্নত প্রোটিন সমৃদ্ধ পানীয়, স্বাস্থ্যকর রক্তের জন্য পানীয়, সব বাচ্চাদের একসঙ্গে অন্য বন্ধুর বাড়িতে খাওয়ার সমেত বিশেষ স্যুপ যার সঙ্গে সামান্য গাজর, টমেটো, মটরশুঁটি দিয়ে খেতে হয়, এর দ্বারা বাচ্চাদের সবজিও খাওয়া হবে, দু মিনিটে নুড্যুলস, পিৎসা ইত্যাদি। আখের রসকে তাচ্ছিল্য করে দিল মাঙ্গে মোরের বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে। যেন ওই খাদ্যগুলো অমৃত সমান। ওই সব না খেলে জাতেই ওঠা যাবে না। গ্রামের মানুষও শহরে এসেও জাতে ওঠার চেষ্টা করেন। ওইসব খাবার খেতে খেতে ক্রিকেট খেলা দেখতে হবে, পরের দিন আলোচনা করতে হবে ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনী প্রচারে মুখ্য ভুমিকায় থাকছেন অবশ্যই সন্তান ও মা, স্কুলের অঙ্কের প্রবীণ শিক্ষক, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা বা নেত্রী। অভিনেতারা যখন খেতে বলছেন তাহলে ভালোই হবে। ওনারা কি আর মিথ্যে কথা বলবেন। মানুষের অগাধ আস্থাকে ভর করে মিথ্যে কারবার করছেন। দর্শক ভুলে যান বিজ্ঞাপনও একটা অভিনয়। পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী মহিলা পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ও স্টেথোস্কোপ ঝোলানো চিকিৎসকরা বিজ্ঞাপনে সামিল করা হয়েছে। এই দুটি পেশার মানুষের বিজ্ঞাপন দেওয়া নিয়ে নীতিগতভাবে প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। এটা চলচ্চিত্রের অভিনয় নয়। ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ ত্যাগ করে তাঁরা কি অভিনয় করে মিথ্যে বিজ্ঞাপনী প্রচার করতে পারেন? এতে কি জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন না? অর্থের বিনিময়ে এবং নীতিগতভাবে এই কাজ তাঁরা করতে পারেন কিনা এই প্রশ্ন ওঠা স্বভাবিক। এর বিরুদ্ধে কোন চিকিৎসক বা চিকিৎসক সংগঠনকে সোচ্চার হতে দেখা যায় না। সরকারি ভাবে তো কখনই নয়। প্রাকৃতিক খাদ্য থেকেই পুষ্টি সাধন হয়, অতিরিক্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ পানীয়ের থেকে পুষ্টি শরীর গ্রহণ করে না। যাঁরা অসুস্থ ও অশক্ত, শক্ত আহার গ্রহণ করতে পারছেন না তাঁদের পক্ষে ওই পানীয় চলতে পারে। সুস্থ লোকের জন্য নয়। তাছাড়া আমাদের দেশে যেভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, পাশ্চাত্য দেশে ওই ভাবে হয় না। লক্ষ রাখা হয় কেউ যেন বিজ্ঞাপনের নামে মিথ্যা কথা প্রচার না করেন। কোন একটি জায়গায় কৃষকদের আলোচনা সভায় প্রসঙ্গক্রমে ওই বিষয়গুলি উঠে আসে। এক কৃষক বললেন, ''টিভিতে ডাক্তারবাবু বলছেন তো অমুক পানীয় দিনে দুবার খেতে।'' ডাক্তার যে অভিনয় করছেন এই সত্যিটা কৃষককে বোঝাতে না পারার ব্যর্থতা বয়ে বেড়াচ্ছি। সাধারণ মানুষের উপর ওই বিজ্ঞাপন কী ভয়ানক প্রভাব ফেলেছে তা গ্রামেগঞ্জে না ঘুরলে বোঝা যাবে না।

শপিং মলের প্যাকেট বন্দী খাবার ঃ চারিদিক এখন শপিং মল গজিয়ে উঠছে। ওখান থেকে কেনাকাটা করা এখন স্টেটাস সিম্বল। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত মলে সব পাওয়া যায়। লুঙ্গি পরা, নীচে বসা কোন বিক্রেতা নেই। টাই পরা ছেলেমেয়েরা আলু, পটল, পেঁয়াজ, মাখন, সস্, ফলের রস, বিদেশ থেকে আমদানি করা ভুট্টার প্রডাক্ট (বহু বিতর্কিত জি এম ভুট্টা থাকা অস্বাভাবিক নয়, জি এম আছে বলে লেবেল করাও নেই) , সয়াবিন তেল, চিনি, আটা, বাসমতি চাল, বাঁশকাঠি চাল (মিল মালিকের দেওয়া নাম), বিস্কুট ইত্যাদির তদারকি করছেন। অন্যান্য জিনিসে সঙ্গে চোখ ধাঁধানো খাবার দাবারের প্যাকেট থরে থরে সাজানো আছে। লাইন দিয়ে মালের দাম দিতে হয়, ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে মেশিন থেকে বিল বেরিয়ে আসে। মনে হয় খাবার ওইখানেই তৈরী হয়। প্যাকেটের গায়ে তৈরীর তারিখ, দাম, পুষ্টি গুণ, শেষ ব্যবহার করার তারিখ লেখা আছে। এমনটা ওইসব মালের গুণাগুণ নিয়ে প্রশ্নই ওঠার অবকাশ নেই, প্রশ্ন করলেই টাই পরা সেলস এক্সিকিউটিভরা (সেলস ম্যান) রে রে করে উঠবে - "আপনি কিছুই জানেন না, এটা কাদের প্রোডাক্ট জানেন, গেয়োঁ ভূত কোথাকার।" ইত্যাদি। ইচ্ছা থাকলেও মালের গুণাগুণ নিয়ে অর্বাচীনের মত কেউ প্রশ্ন করে না। যে মূল খাবার থেকে প্রক্রিয়া করে প্যাকেট করা হচ্ছে সেটা কি বিশুদ্ধ? যে জল থেকে ঠান্ডা পানীয় তৈরী হচ্ছে সেই জলটা বিশুদ্ধ কিনা। ফসলটা জৈবিক উপায়ে বিষ সার না দিয়ে কি উৎপাদিত হয়েছে? না সেইসব ব্যাপারে প্যাকেটের গায়ে অনুল্লিখিত। ব্যতিক্রম আছে। কিছু শাজসবজি জৈব উপায়ে তৈরীর শংসাপত্র দিয়ে বেশী দামে বিক্রি হচ্ছে। বাজার থেকে কেনা খোলা আটার পুষ্টিগুণ প্যাকেটের আটার থেকে কম নয়। কোনো খাদ্যকে সুন্দর মোড়কে ভরলেই পুষ্টগুণ বেড়ে যায় না। প্যাকেট খাবারের ব্যাপক প্রচারের চোটে আমাদের প্রশ্ন করার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের মনে হয় না ২৩টা একান্ত খাদ্য প্রাণ বা অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে শোষণ হবে কিনা। শুধু খেলেই তো আর হবে না, অতিরিক্ত খাদ্যের গুণের শোষণ হওয়া চাই। পুষ্টি বিজ্ঞান, শরীর বিদ্যার সঙ্গে ওই বিজ্ঞাপন কোনভাবেই খাপ খায় না। আসলে চকচকে খাবারের প্যাকেট হয়ত আমাদের প্রশ্ন করা থেকে বিরত রাখে। রোদে পুড়ে বাজারের রমেশ কিংবা রাকিবের থেকে মাল কিনতে হয় না। সুবিধা এই ঠান্ডা ঘরে ঢুকে কেনাকাটা করা যয় এবং সারাদিন খোলা আছে এই মল। কিন্তু সেটাই সব নয়।

এক নতুন বাজার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। চাষীদের উৎপাদিত পণ্য এক শ্রেণীর কোট পরা টাই পরা গাড়ি চড়া দালালরা কিনে নিয়ে আসছেন শপিং মলগুলিতে। হাটের ঐতিহ্য আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। বহু জায়গায় হাটের বদলে বাজার বসছে। শপিং মল আসায় আর প্রথাগত বাজারের ধারণাটাই পাল্টে যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুচরো পণ্যে ৫১% বিদেশী লগ্নীর বিরোধীতা করে সরকার পক্ষ থেকে সরে আসেন। অনেক সমালোচনা, কেউ কেউ তো 'কী সর্বনাশ!' বলে রব তুলছেন। এতে নাকি চাষীর ও ক্রেতার উভয়ের লাভ। এহেন একটা ভালো জিনিসের বিরোধীতা করা। এইজন্য বাঙালীর কিছু হয় না। সত্যি কি তাই? কংগ্রেস ছাড়া ভারতের বেশীর ভাগ রাজনৈতিক পার্টি এর বিরোধীতা করেছেন।

ওয়ালমার্টের মত কুখ্যাত মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ভারতের কিছু বাছাই করা শহরে শপিং মল করতে চায়। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চোখ কান বুজে এর পক্ষে সওয়াল করলেন। খোদ আমেরিকার কিছু শহরে ওই কোম্পানীকে মল তৈরী করতে দেয়নি। ওদেশের সরকার বলছে স্থানীয় জিনিস কিনতে আর আমাদের দেশে শপিং মলের পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচার চালায়। সাম্প্রতিক ইতিহাস বলে, ওই কোম্পানী প্রথম দিকে চাষীর থেকে বেশী দামে মাল কিনে, নিজের ক্ষতি করে কম দামে মাল বেচতে শুরু করে। ক্রেতা খুশি। দেখ-এরা কত কম দামে মাল দেয়। আমাদের বাজারের চাষীরা/বিক্রেতারা কত বেশী দামে মাল বেচত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ওই কোম্পানী মল চালু হওয়ার পর সাধারণ দোকানদাররা ওই ক্ষতি সহ্য করতে না পেরে দোকান তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন, বহু মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছেন। হাজার হাজার দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারপর কোম্পানীরা বাজার দামের থেকে ৩০% বেশী দামে মাল বিক্রি করতে শুরু করছেন। চাষীরা আর দাম পাচ্ছেন না, জলের দরে মাল বেচতে হচ্ছে কারণ দেশজ লুঙ্গি পরা খালেক, বেচারামদের মত দালাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন। শপিংমলের বাবু (দালাল) ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। ইতিমধ্যে পাড়ার সবজি বিক্রেতা রমেশ কিংবা রাকিব ভিখারি হয়ে গিয়েছেন। ভরসা এখন ওই মল। ভারত কি এমন আলাদা দেশ যেখানে ওই ঘটনা ঘটে না। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা নিশ্চিত করে কেউ দেননি। আসলে আমরা আমাদের দেশটাকে আমেরিকার মত দেখতে চাইছি। গজদন্ত মিনারে বসে থাকা কতিপয় নীতি নির্ধারক চাপিয়ে দিতে চাইছেন তাঁদের বিদেশী বসকে খুশি রাখতে। ভারতবর্ষকে ওদের চোখ দিয়ে দেখতে গিয়েই এই বিপত্তি।

খাদ্য নিয়ে অসম তুলনা ঃ ভারতের সঙ্গে আমেরিকার কোন তুলনা চলে না। যে দেশে কোন গ্রাম নেই শুধুই হাজার হাজার হেক্টর জুড়ে ফার্ম হাউস এবং ফার্মিং এর সঙ্গে মাত্র ২% মানুষ যুক্ত। চাষী নয়, ফার্ম হাউস ও করপোরেট ফার্মিং ফসল বৈচিত্র হাতে গোনা যায়। ভারতের উন্নয়নের জন্য ভারতের আর্থসামাজিক দিক দেখে, ভারতের মানুষকে সামিল করতে হবে, গ্রামকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে। শহরের উন্নতি করা মানে গ্রামের উন্নতি নয়। খাদ্য উৎপাদন মানে শুধু উৎপাদন নয়, এর সঙ্গে কৃষকদের মানবিক ও আর্থসামাজিক দিক জড়িত। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কারখানার মত উৎপাদন প্রক্রিয়া নয়। কৃষকের কাছে এটা জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতি। জমির থেকে তাঁকে সারা বছরের খাবার তৈরী করতে হত। এখানে খাবার উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে দূরত্ব বেশী নয়, বড় জোর ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে। গ্রামে তো আরো কাছে। আমেরিকায় ফার্ম হাউস থেকে বাজার ও শপিংমলের দূরত্ব কয়েক হাজার কিলোমিটার হতে পারে। মার্কিনিরা অবাক হয়ে যায়, যখন শোনে আমাদের খাবার মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরেই তৈরী হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন ভারতে চাষের জন্য ৬০% মানুষের দরকার নেই, চাষ লাভজনক নয়, ৩০% শতাংশ মানুষ চাষের কাজ করলেই চলবে ইত্যাদি। তাহলে ওই বিপুল সংখ্যক মানুষ কোথায় যাবেন, কী করবেন এ নিয়ে কোন দিশা নেই। চাষ লাভজনক নয়—এটা ঠিক নয়, কোনো মরশুমে কোনো বিশেষ ফসলের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, তবে সবৈব সত্য নয়। এটা ঠিক চাষের খরচ বাড়া ও নায্যমূল্য না পাওয়ার জন্য কোনো কোনো চাষ লাভজনক হচ্ছে না। তারজন্য কি কৃষকরা দায়ী? অতি সরলীকরণ নয়? আবার শপিংমলের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ ফসলের চুক্তি চাষ হয়, যে ফসল আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। অনেকটা এই রকমভাবে বলা হচ্ছে আমার (মার্কিন) ফসলই তোমার ফসল। ওদের খাদ্যাভাসটাকে আমাদের খাদ্যাভাসে পরিণত করতেই হবে। সকালের খাবার হিসাবে মুড়ি, চিড়ে, চিড়ে ভাজা, রুটি, পান্তাভাত, ফেনা ভাত এসব যেন খাবারই নয়। পিৎসা, বাটার টোস্ট, ভুট্টার চিপস এখন প্রাতরাশে জায়গা করে নিচ্ছে। স্ট্রবেরী, প্লাম, লাল বাঁধাকপি, ব্রকলি (সবুজ ফুলকপি, লাল-হলুদ

ক্যাপসিকাম, ঘেরকিন (এক ধরনের শশা), বেবি কর্ণ এসব নাহলে আর চলছে না। প্রচার মাধ্যমেও প্রচার চলছে। শহুরে ক্রেতারা না কিনলে পিছিয়ে পড়বেন—এই আশঙ্কাতেই হয়ত কিনছেন। অথচ বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটির জন্য আমাদের দেশে সারা বছরই নানা ধরনের ফসল তৈরী হয়। কোনো কিছু প্যাকেট বন্দী করতে হয় না। শীত প্রধান দেশে ফসল বৈচিত্র্য কম। তাই ফসল, সবজি ও ফলের প্রক্রিয়াকরণ করে রাখতে হয় অসময়ে খাওয়ার জন্য। প্যাকেট বন্দী করা বিশেষত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের ফলে খাদ্যে গুণমান কমে যায়। টমাটো বাড়িতে আর ক'দিন ঠিক থাকে? অথচ সংরক্ষকের (সোডিয়াম বেনজোয়েট, পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইটের মত ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) দ্বারা টমাটো সস্ ছ'মাসের বেশী বোতলবন্দী থাকে। সেইভাবে নানা ধরনের বোতলবন্দী ফলের রস বিক্রি হচ্ছে। আমাদের দেশে বহু রকমের মরশুমি ফল পাওয়া যায়, বোতলবন্দী ফলের রসের প্রয়োজন পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর মধু হওয়া সত্ত্বেও মধুর খাওয়ার প্রচলন খুব কম।

এখানে সারা বছরই বৈচিত্র্যময় ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মে ফুলকপি, ক্যাপসিকাম, টমাটো খাওয়া চাই। অসময়ে সবজি চাষে প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। খেতে যে খুব ভালো হয় তাও নয়। বিষটা ফ্রিতে হল আর কি। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে দেশজ চাষ ব্যবস্থা, জৈব কৃষি, ফসল দবচিত্র ও সংস্কৃতি মানেই অবজ্ঞার বিষয়। অদ্ভুতভাবে খাবারেরও শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। দেশজ ফসল যেন গরীব লোকের খাবার। বেশী দামের বিদেশী খাবার মানে বড়লোকের খাবার। প্রচার এমনভাবে চলছে বেশী দামের খাবার মানে বেশী পুষ্টি। প্যাকেট বন্দী হলে তো কথাই নেই। শীত প্রধান দেশে পটল, ঝিঙে, কুমড়ো, চাল কুমড়ো, কাঁকরোল, উচ্ছে, কুঁদরী, রাঙালু, কচু, ওল, এঁছোড়, ধুঁধুল, প্রায় ৩০ রকমের শাক, ৬০ রকমের ভোজ্য ছাতু, ৮ রকমের মেটে আলু, বকফুল, চিচিঙ্গা, লাউ, কাঁচকলা-মোচা-থোড়, ট্যাঁড়শ, টক ট্যাঁড়শ, মাখনশীম, তরুকলা শীম, লতা কস্তুরী, শ্যাপলা, পিপুল ও চৈ (ঝালের জন্য), বহুয়ার কাঁচা ফল (কচড়া), আমড়া, নোড়, আমলকি, লিচু, ফলসা, জাম, গোলাপ জাম, জামরুল, বকুল ফল, লেবু, বাতাবী লেবু, আঁশফল, নারকেল, সবেদা, আতা, তাল (পাকা ও কাঁচা), খেজুর, কামরাঙা, করমচা, কেন্দু (ফল), বেল, কয়েদবেল, পানিফল, পান, ড্যাফল, (ডেওয়া), ক্যাওড়া (লবনাম্বু উদ্ভিদের ফল, চাটনি হয়), তরমুজ, বৈঁচি, শিয়াকুল, কাঁঠাল, লটকা, কাজু, সজিনা ডাটা-ফুল-পাতা, নাজনা ডাটা, তিল ও বাজনা গাছের ভোজ্য তেল, মুগ, অড়হড়, বিউলি ও কলাই ডাল, প্রায় ৫০ রকমের মাছ, ৮২০০০ রকমের চাল, ৩৬৬৮ রকমের বেগুন, জোয়ার, বাজরা, মাড়োয়া, দই, ঘোল, গুড় ইত্যাদি। শীতের সবজির কথা বাদ দিয়েই বলা যেতে পারে পৃথিবীর খুব কম দেশেই এই বিপুল ফসল বৈচিত্র্য আছে। অথচ বিদেশী ফসলের প্রতি কত আগ্রহ দেখানো হয়। যা নেই তার জন্য অনেক মাথাব্যথা যা আছে তাকে রক্ষা করা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রয়াস চোখে পড়ে না।

টাটকা ম্যানিয়া ঃ অনেক মানুষ আছেন সকাল সকাল বাজারে যান টাটকা নধর শাক সবজি কেনার জন্য। এটা সত্যি বাসি-নেতানো সবজি কে আর কিনতে চায়। চিকিৎসকরাও পরামর্শ দেন টাটকা শাক সবজি খাওয়ার। আসলে টাটকা শাক সবজি কতটা টাটকা প্রশ্ন এটা নিয়ে। টাটকা শাক সবজি বলতে বোঝায় ক্ষেত থেকে তোলা সকালের ফসল। শশার গায়ে হালকা কাঁটা অনুভব করা যায়, কাঁকরোলের গায়ের কাঁটাগুলো ভেঙে মসৃণ হয়নি, পটলের গায়ে শুকনো ফুল লেগে আছে, ফসলের ত্বক কোঁচকানো নয়, পেঁপের বোটার কাছে আঠা ঝরছে, ঝকঝকে, শাকের পাতা নেতিয়ে যায়নি ইত্যাদি। এটা যদি আজ থেকে ৪০ বছর আগে হত তাহলে একে সত্যি টাটকা বলা যেত। কারণ সেই সময়ে রাসায়নিক সার ও রোগ ও পোকামারা বিষ ব্যবহার হত না। ফসলে ওই সব বিষের অবশেষ থাকার প্রশ্নই ছিল না। বিশুদ্ধ টাটকা সবজি ছিল। কিন্তু টাটকা সবজির মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢুকছে নানারকম বিষ। বাড়ছে ক্যানসারসহ নানাবিধ নাম না জানা ব্যাধি। ওইসব কৃষি বিষকে অমৃতের পর্যায়ে তোলার জন্য ঔষধ বলা হয় অথচ বেশীর ভাগই রাসায়নিকই শরীরে ক্যানসারসহ নানা রোগ তৈরী করে। এই নিয়ে প্রচুর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। স্প্রে করার অন্তত ৭ দিন পরে ফসল তোলা উচিৎ। স্প্রে করার পরদিনই ফসল বাজারে আসছে। তাই বাসি হলে কিছুটা বিষ কমে। শপিংমলের ঠান্ডা জায়গায় কয়েকদিন বেশী থাকবে। তবে বিষের অবশেষ থাকবেই এবং তা জলে ধুলে এবং গরম জলে সিদ্ধ করলেও সম্পূর্ণ প্রশমন হয় না। ফসলের জলে দ্রাব্য বি ও সি ভিটামিনের থেকে ওই বিষ বর্জন করা জরুরী। কৃষি ও উৎপাদিত খাবার সঙ্গে পুষ্টির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফিকে হয়ে আসছে। লক্ষ্যণীয় বিষ ও সার প্রয়োগ করা ফসল তাড়াতাড়ি পচে যায়। ক্যাপসিকাম, লংকা, পটল, বেগুন ইত্যাদি দ্রুত পচনশীল। ঘরে ঘরে ফ্রিজের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সবজি পচে যায়।

রাসায়নিক সার ও বিষের চাষ ঃ বিদেশে নিষিদ্ধ কৃষিবিষ এখানে চালু রয়েছে। শ্রীলংকায় সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘাস মারা বিষ (আগাছা নাশক) গ্লাইফসেট এদেশে চালু আছে। এটা অবশ্য মানুষের ঔষধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কলকাতা শহর দূষিত শহরগুলির মধ্যে একটি। আধঘন্টা শহরে থাকলে প্রচুর দূষিত ভাসমান কণা ও ধোঁয়া শরীরে প্রবেশ করে। যাঁরা ধুমপান করছেন, কারখানার বিভিন্ন রাসায়নিক রং, প্লাসটিক, এসবেসটস নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, উপযুক্ত নিরাপত্তা গ্রহণ না করে জমিতে কীটনাশক স্প্রে করছেন, রেললাইনে ঘাসমারা বিষ প্রয়োগ করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই দূষণের প্রত্যক্ষ শিকার। যেখানে পরিবেশ দূষিত সেখানে ওই টাটকা সবজি কতটুকু শরীরে কাজ আসবে? আবার ওই সবজিতে কীটনাশকের অবশেষে পরিপূর্ণ। বেশীর ভাগ শাক সবজি এখন শংকর জাতের অর্থাৎ প্রত্যেক বছর বেশী দামে বীজ কিনতে হবে এবং ওই ফসলে

প্রচুর সার ও কৃষিবিষ প্রয়োগ করতে হবে। অথচ দেশী অনেক ফসলই উচ্চ ফলনশীল, সার বিষ ছাড়া ভাল ফলন হয়, বীজও বছর বছর কিনতে হয়। একবার বীজ সংগ্রহ করার পর বীজ রাখার ও উৎপাদন কৌশল জানলেই সারা জীবন একই বীজ ব্যবহার করা যাবে। এটা কোন কঠিন বিষয় নয়। অনেক সচেতন চাষী নিজের খাওয়ার ফসলে বিষ প্রয়োগ করেন না, কেউ কেউ রাসায়নিক সারও প্রয়োগ করেন না। আসলে সময়মত বাজার ধরার প্রশ্নটা রয়েছে। রোগ, পোকা ধরলে ফসলের উৎপাদন ও গুণগত মান কমবে। ওই সব শংকর জাতের ফসলে রাসায়নিক বিষ ছাড়া আর কেউ রিস্ক নিতে চাইছেন না। দিন দিন সার ও বিষের প্রয়োগ বেড়েই চলেছে। মাদক দ্রব্য নেশার মত সার বিষের পরিমাণ বাড়ছে। রোজই স্প্রে হচ্ছে, কোথাও এবেলা ওবেলা। তাতেও কাজ হচ্ছে না। অনেক জায়গায় বেগুন ও পটল চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ধরেই নেওয়া হয়েছে সার ও বিষ ছাড়া চাষ হবে না। কৃষকরা এক বিষচক্রে আবর্তিত হচ্ছেন। কিন্তু বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। চাই সদিচ্ছা ও সচেতনতা। আমাদের দেশে ফসলে সার ও বিষের কতটা অবশেষ আছে তা পরীক্ষা করা হয় না একমাত্র দুএকটি গবেষণা ছাড়া। সুতরাং যিনি কম বিষ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে যিনি বেশী দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে ফসলের গুণগত মানের কোন তফাৎ রইল না। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২৫৪টি সবজির নমুনার মধ্যে ১২০টিতে মাত্রাতিরিক্ত কৃষি বিষের অবশেষ আছে। চালের ১৯টি নমুনার মধ্যে প্রত্যেকটিতে বিষের অবশেষ আছে। ২০০৭ সালে কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন ভারতের ৬৪% সবজি ও ৪৬% ফলে মাত্রাতিরিক্ত কৃষিবিষের অবশেষ আছে। রাসায়নিক কীটনাশকের প্রভাবে মানবশরীরে বিভিন্ন গোলযোগ দেখা যায়। পেটের রোগ, বাতজ বেদনা, বন্ধ্যাত্ব, নিদ্রাহীনতা চুলওঠা, বিকলাঙ্গতা, জড়বুদ্ধি এবং ক্যানসার। বিষের অবশেষ পাওয়া যাচ্ছে মার্তৃদুগ্ধে, গোদুগ্ধে, ডিম, মাছ, মাংস, জল, শাক-সবজি ও ফলে। কিসে নেই? কেরালার কাসারগড় জেলায় কাজুবাদামে আকাশ থেকে এন্ডোসালফন কীটনাশক স্প্রে করার পর বহু বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। ওই কীটনাশককে বিষক্রিয়ার জন্য (আগে থেকেই জানা ছিল) নিষিদ্ধ করবার প্রস্তাব আনা হয়। কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিষিদ্ধ হতে গিয়েও হল না। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে ওই কীটনাশক নিষিদ্ধ। ভুপালে কার্বারিল নামক কীটনাশক তৈরীর কারখানায় ১৯৮৪ সালের ৩ রা ডিসেম্বরের মধ্যরাতে মিথাইল আইসোসায়ানেট গ্যাস (কীটনাশকের তৈরীর এক উপাদান) লিকের দুর্ঘটনায় ১০০০০ মানুষ প্রাণ হারান এবং কয়েক লক্ষ মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। ওই অসহায় মানুষের পরিবাররা নামমাত্র ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ওই অপরাধের জন্য কারখানা বিদেশী ও দেশী কর্তৃপক্ষের কারুর কোন জেল বা হাজতবাস হয়নি। উল্লেখ্য ওই গ্যাস মাত্রাতিরিক্ত ভাবে মজুত করা হয়েছিল এবং এটাই পৃথিবীতে সব থেকে বড় কারখানা দুর্ঘটনা।

জৈব উপায়ে প্রস্তুত খাদ্যে পুষ্টিগত মান বেশী। তাড়াতাড়ি পচে না। স্বাদও ভালো, পানসে নয়। জৈব উপায়ে ফসলের উৎপাদনশীলতা রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদিত ফসলের থেকে বেশী। ফুলিয়ার কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দীর্ঘ ১১ বছরের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে জৈব উপায়ে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ কম নয় এবং তা খরচ সাপেক্ষ নয়। ২০০২ সালের সুলতান ইসমাইল দেখিয়েছেন জৈব উপায়ে উৎপাদিত ফসলের পুষ্টিগুণ বেশী।

ফসল	উপকরণ	প্রোটিন	শর্করা	লিপিড
		(মিগ্রা ১০০ গ্রাম)	(মিগ্রা ১০০ গ্রাম)	(মিগ্রা ১০০ গ্রাম)
ট্যাঁড়শ	রাসায়নিক	০.৯৪	৪.০০	০.৮০
ট্যাঁড়শ	জৈব	১.৩০	৬.২	১.১৫
বাদাম	রাসায়নিক	১.১০	৫.৭০	১.২০
বাদাম	জৈব	১.৩৪	৬.৯০	২.০০

২০০৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে জৈব উপায়ে উৎপাদিত টমাটোতে ক্যানসার ও হৃদরোগ প্রতিরোধক ফ্লাভোনয়েড যৌগ রাসায়নিক উপায়ে উৎপাদিত টমাটোর থেকে বেশী। তাছাড়া এতে ভিটামিন সি, শর্করা ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশী আছে। এই রকম বহু আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু জৈব খাদ্যের পুষ্টিগত মান নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর প্রচার চলে। এটা নিশ্চিত যে জৈব উপায়ে ফসলে কোন প্রকার রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পাওয়া যাবে না। শরীরে বিষ ঢুকছে না এটাই বড় কথা। কৃষকরা জানেন সুগন্ধি ধানে রাসায়নিক সার দিলে ধানের গন্ধ কমে যায়। রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ করলে তা উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে এবং বিপাকীয় কাজকর্মের পরিবর্তন ঘটায়। গাছ নরম ও নধর হয়ে যায় অল্প সময়ে (শাকের ক্ষেত্রে ভালো বোঝা যায়) এবং গাছের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়। সহজেই রোগ পোকার আক্রমণ ঘটে, তাই আরো বিষ প্রয়োগ করতে হয়। জৈব উপায়ে উৎপাদিত ফসলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না, চাষ ব্যবস্থা অনেক টেকসই। মূল স্রোতের কৃষিতে কিন্তু জৈব কৃষিকে অবজ্ঞার চোখেই দেখা হয়। তা না হলে রাসায়নিক সার, বিষ ও বীজের ব্যবসা হবে না আর মানুষের রোগব্যধির প্রকোপও কমে আসবে। এটা বিশেষ একটা শ্রেণীর অভিপ্রেত নয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হচ্ছে বিশেষ একটি রাসায়নিক দিয়ে সবজিও ধুয়ে ফেলতে। এতে কীটনাশকের প্রভাব কমবে। কীটনাশক ছাড়া চাষ করা যায় সেটা আর বলা হচ্ছে না। যেমনভাবে তামাক চাষ বন্ধ না করে সিগারেটের প্যাকেটের উপর ক্যানসার নিয়ে সতর্কতা দেওয়া আছে। সিগারেটের বিক্রি কমে গেলে দেশের জিডিপি কমে যাবে। লক্ষ্যণীয় কিউবা দেশটা পুরোটাই জৈব দেশ। অথচ এর কোনো প্রচার নেই। ভারতের কিছু রাজ্য সিকিম ও উত্তরাখন্ড জৈব রাজ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। অনেক রাজ্যে জৈব কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছেন। সম্প্রতি ভুটান জৈবদেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের নামে অপ্রাকৃতিক জিন শস্যের বুজরুকি ঃ ফসলে রোগ পোকা লাগলে খুব সহজেই কৃষকরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। দেশী ফসলে সার লাগে না, রোগ পোকাও কম লাগত। রাসায়নিক কৃষিতে শংকর জাতের বীজে ব্যাপক পোকামাকড় লাগে। তার জন্য বিষের ব্যবহারও বেশী করতে হয়। ধীরে ধীরে বিষের পরিমাণ বাড়ছে, পোকার প্রতিরোধ শক্তি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। কৃষকরা দিশেহারা। এই অবস্থায় যদি জিন কারিকুরি করে এমন ফসল তৈরী করা যায় যাতে গোটা গাছটাই কীটনাশকের মত কাজ করবে বিশেষত লেদা পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে। ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে মন চায় না। জিনশস্য বিটি তুলো, বেগুন, ধান ইত্যাদির প্রস্তুতকারকরা সেই রকম দাবি করছেন ঠিকই

সালের ৩১ এ আগস্ট খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছিল বেহালার 'গরীব ভান্ডার'—নামক দোকানের সরষের তেল খেয়ে প্রচুর মানুষের পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক খবর। বেহালার ক্লাইং ক্লাবের থেকে চোরাই করা ট্রাইক্রিসাইল ফসফেট রেপসিড তেলের সঙ্গে মিশিয়ে সরষেত তেল বলে কম দামে বিক্রি করা হয়েছিল। ট্রাইক্রিসাইল ঈষৎ সরষের তেল গন্ধযুক্ত হলুদ রঙের তৈলাক্ত তরল, অগ্নি নির্বাপক হিসাবে ব্যবহার হয়। রাস্তার পাশে এগরোল, চাউমিনের সঙ্গে দেওয়া টমাটো ও চিলি সসের রং দেখলেই বোঝা যায় কৃত্রিম রং দেওয়া আছে। সেই সঙ্গে ভেজাল হিসাবে কুমড়ো ইত্যাদি। কালো ভিনিগার ও আজিনামোতোর মিশ্রণে সয়াসস তৈরী হয়, সয়াবিনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

দুধে ইউরিয়া-ফ্যাটের পরিমাণ ঠিক দেখানোর জন্য, ডিটারজেন্ট-ফেনা ভাবের জন্য, ময়দা, ছানার জল, অ্যারারুট, আমোনিয়াম সালফেট যাতে ল্যাকটোমিটারে দুধের ঘনত্ব নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে, ফর্মালিন-যাতে দুধ তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়।

চায়ের সঙ্গে-লোহার ও কাঠের গুঁড়ো, মাটির জিরে-গোটা জিরের সঙ্গে, মেটানিল ইয়েলো ও চাল গুঁড়ো- হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে, লাল ঘেষ-লংকার গুঁড়োর সঙ্গে, মিষ্টিতে রং ছাড়া ভেজাল হিসাবে ময়দা, সুজি ক্ষতিকারক নয়। দই-এ আগার আগার ও ডালডা, পনিরে ময়দা। ঘুঘনি ও বেসন বেশী হলুদ দেখানোর জন্য মেটানিল ইয়েলো। পোলাও ও বিরিয়ানীতে মেটানিল ইয়েলো। মধুতে লাল রং। পাটালিতে জৈব অ্যাসিড (অ্যাসেটিক) দেওয়ার জন্য রং সাদা হয় কিন্তু খাবার পর টাগরার ছাল উঠে যায়। এই ঘটনা ঘটে সস্তার লাল, হলুদ, সবুজ, ঝাল লজেন্সে পাওয়া যায়। অসময়ে ফিস ফ্রাই-এর স্যালাডের জন্য কুঁচোনো কাঁচা পেঁপের সঙ্গে মেটানিল ইয়েলো দিয়ে গাজর ও কঙ্গো রেড দিয়ে বিট তৈরী হয়। চোলাই মদে মেথিলেটেড স্পিরিট। মাংসে ও দুধে জল, চালে কাঁকর ও মাখনে কলা খুব পরিচিত ভেজাল, বহুকাল থেকে চলছে। ঔষধে ভেজালের সঙ্গে আমরা পরিচিত। ভেজাল ধরার জন্য ফুড ইন্সপেক্টরের কথা আমরা শুনি কিন্তু সেই পদের আধিকারিককে দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। জনগণ সচেতন হলে তাহলে এই ভেজাল রোধ করা যাবে।

ইদানিং দই এর বদলে আইসক্রিমের খুব চল হয়েছে। আগের যুগের মত জল, চিনি আর রং দিয়ে তৈরী আইসক্রিম নয়। এর মধ্যে বহু রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়। গাউর গাম ব্যবহৃত আইসক্রিমের শক্ত ভাব ও চিনির দানা জমে গিয়ে আবার চিনি দানার আকার যাতে না নেয়। ১৯৯০ সাল থেকে আমেরিকা ও কানাডায় এর ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা আছে। সামান্য পরিমাণ শরীরে প্রবেশ করলে কারুর পেট ফাঁপতে পারে ও ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক ও লোহা শোষণে বাধা দেয়। কৃত্রিম অনুমোদিত রং সংরক্ষক হিসাবে দেওয়া সোডিয়াম বেনজয়েটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নানা সমস্যা ঘটায়। শিশুদের হাঁপানি ও ক্যানসার হতে পারে। সংরক্ষক হিসাবে পটাশিয়াম সরবেট ক্যানসার সৃষ্টিকারক। পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত মোনো ডাইগ্লিসেরাইড শরীরের পক্ষে ভালো নয়। মোনো ডাইগ্লিসেরাইড যুক্ত আইসক্রিম খাওয়া উচিৎ নয়। তাছাড়া কৃত্রিম হর্মোন থাকার জন্য আমেরিকায় অল্প বয়সী মেয়েরা মোটা হয়ে যাচ্ছে। কেন্টাকি ফ্রায়েড চিকেন, হট ডগ ইত্যাদি পাশ্চাত্য খাবারে অস্বাস্থ্যকর আজিনামোতো, সংপৃক্ত ফ্যাট ইত্যাদি থাকে। সম্প্রতি আমেরিকার ফুড এবং ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন স্বীকার করেছেন ওদেশের মুরগীর মাংসে আর্সেনিকের উপস্থিতির কথা। মুরগীর খাবারে আর্সনিক যৌগ মেশানো হয়, সেখান থেকেই মাংসে আর্সনিক চলে আসে। আমাদের দেশে সেচের কিন্তু বাস্তবে তা ঘটছে না। কয়েক বছর পরে পোকার প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়, গৌণ পোকা মুখ্য পোকায় পরিণত হয়। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়ে চলে। এটাই বাস্তব। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা তাই বলে। পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া মানুষ ও প্রাণীর শরীরে নানা খারাপ লক্ষণ প্রমাণিত হয়েছে। এক শ্রেণীর আমলা, রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞানীর সঙ্গে অশুভ আঁতাত তৈরী হয়েছে। তারই শুধুমাত্র মুনাফার জন্য সমস্ত ন্যায় নীতি ত্যাগ করে ওই অপ্রাকৃতিক, পেটেন্টড, ঝুঁকিপূর্ণ, খরচ সাপেক্ষ ও পরিবেশ বিরোধী ফসলের জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। এর দ্বারা আমাদের বীজের সার্ব্বভৌমত্ব নষ্ট হবে। অথচ পোকা মারার অনেক সহজ ও সুলভ ও প্রকৃতিবান্ধব প্রযুক্তি রয়েছে। ভারতে শুধুমাত্র বিটি তুলোর বাণিজ্যিক চাষের অনুমতি আছে। বিটি বেগুনের চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। পৃথিবীর বহু দেশই জিন শস্য চাইছেন না, ভারতের ১২টি রাজ্যও বিটি জিনশস্য চাইছেন না। একটি বহুজাতিক কোম্পানীর প্যাকেট ভরা পপ কর্ণে ভুট্টার জাত নিয়ে জানতে চাওয়া হলে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য ওই প্যাকেট আগে বিনা পয়সায় অন্য কিছুর সঙ্গে দেওয়া হত। অন্যদিকে আমেরিকায় জি.এম ভুট্টার ব্যাপক চাষ হচ্ছে। ওদেশের বহু প্রসেসড খাবার ভারতে আসছে। এই নিয়ে পরিস্কার নিয়ম কানুন নেই।

মানুষকে বোকা বানানোর এক শয়তানি হল জিন পরিবর্তিত গোল্ডেন রাইস বা সোনালী ধান। ঈষৎ গাজরের মতো গন্ধ যুক্ত হালকা হলুদ রঙের এই চালের প্রতি গ্রামে ১৩৩ মাইক্রোগ্রাম (১ মিগ্রার ১০০০ ভাগের এক ভাগ = ১ মাইক্রোগ্রাম) বিটা ক্যারোটিন (ভিটামিন এ'র আগের পর্যায়) আছে। এর দ্বারা অন্ধত্ব নিবারণ হবে। এই চালের দাম অনেক। মানুষের শরীরে এর কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তা অজানা, ভাত হওয়ার পর কতটা ভিটামিন থাকবে তাও জানা নেই। উপরন্তু অপুষ্টিতে রোগে ভোগা মানুষের শরীরে ভিটামিন 'এ' খেলেই হবে না। এরজন্য সার্বিক পুষ্টি উপযুক্ত পরিমাণ স্নেহ পদার্থ থাকতে হবে। গরীব মানুষ মোটা চাল জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে ওই চাল জোগাড় করা বিলাসিতা। যেমনটা ফরাসী বিপ্লবের সময় রানী আতোঁয়নাৎ বলেছিলেন রুটি না পেলে কেক খেতে। গাজরের কথা বাদ দিলাম। সারাবছরই কম বেশী পাওয়া যায় কচুশাক, সজনে পাতা, কারিপাতা, নটেশাক, মুলোশাকে সোনালী ধানের থেকে ১২ (নটেশাক) থেকে ৩৫ গুণ (সজনেপাতা) বেশী। যাঁরা বিজ্ঞানের অভিনবত্বের জন্য এই ধানের প্রচার করছেন তাঁরা এই সহজলভ্য ও সুলভ ও ঝুঁকিবিহীন ফসলের কথা চেপে যাচ্ছেন কার স্বার্থে?

খাবারে অন্য দূষণ ঃ মাটির তলার জল প্রচুর পরিমাণে তোলার জন্য পানীয় ও সেচের জলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়। রাজ্যের ৩৪১ ব্লকের মধ্যে প্রায় ১/৩ ব্লকই আর্সেনিক কবলিত। নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ও ক্যানসারের মত মারণ রোগ থাবা বসিয়েছে। সেচের জলের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলে আর্সেনিক প্রবেশ করছে। চালের ক্ষেত্রে ভাতের ফ্যানের মাধ্যমে অনেকটা আর্সেনিক বেরিয়ে যায়। বীরভূমের কিছু জায়গায় ফ্লোরাইডের দূষণ ধরা পড়েছে। ধাপার মাঠে উৎপাদিত সবজিতে কীটনাশক ছাড়া সিসা, ক্যাডমিয়াম, পারদ, আর্সেনিক মত ভারী ধাতুর অতিরিক্ত উপস্থিতি ধরা পড়েছে। বেগুন চকচকে করার জন্য ফিউরাডন নামক তীব্র দানাদার জাতীয় বিষের দ্রবণে চুবিয়ে রাখা হয়। কলায় ওই বিষ বিঘায় ৪-৫ কেজি প্রয়োগ করা হয় যা সহজেই কলায় চলে আসে। পুকুরে মাছ ধরার জন্য এন্ডোসালফান বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে মাছ মরে ভেসে ওঠে, ধরতে সুবিধা হয়। খাদ্য আর বিশুদ্ধ নেই। ১৯৮৮

জলের মাধ্যমে ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ খাবারে চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণীপালন মৎস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে মুরগীর মাংসে ও ডিমে ১০টার বেশী আন্টিবায়োটিক পাওয়া যাচ্ছে। ওই মাংস খাওয়ার ফলে মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট আন্টিবায়োটিগুলির কাজ না করার সম্ভাবনা বেশী। পোল্ট্রিতে প্রয়োজনের তুলনায় বেশী অনেক আন্টিবায়োটিক প্রয়োগ হয়।

খাবার নিয়ে রাজনীতি ঃ ১৯৬০ এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারকে সবুজ বিপ্লব চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। সেটা ছিল অসম্মানের। ১৯৬৬ সালে উত্তর ভারতের খাদ্য সমস্যা মেটানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য চাইলে ওদের পররাষ্ট্র নীতির পাবলিক ল ৪৮০ (পি এল ৪৮০) এর মাধ্যমে ভারতকে খাদ্য সাহায্য দেয়। কিন্তু সাহায্য শুরু হওয়ার কিছুদিন পরে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আমেরিকার ভিয়েৎনাম আক্রমণকে নিন্দা করায় খাদ্য সরবরাহ সীমিত করে দেয়। ভারতের অনুনয়ে আমেরিকা খাদ্য সরবরাহ করতে স্বাভাবিক রাজি হয় যদি ভারত সবুজ বিপ্লব চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য লাল বাহাদুর শাস্ত্রী খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আমেরিকান প্রযুক্তি গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর দেশের নিরন্ন মানুষকে দ্রুত খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে ওই চুক্তিতে ভারত সরকার স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে মার্কিন কৃষি সচিব বলেছিলেন, ''খাদ্যকে আমরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি। খাদ্যশস্য আমরা মানবিক কারণে বন্টন করি না। রাজনৈতিক কারণেই করি, আমাদের পছন্দমত সরকার থাকলেই সেই দেশকে প্রয়োজনে খাদ্য সরবরাহ করি''। এরপরের ঘটনা আমরা কম বেশি জানি। বিশেষ করে সবুজ বিপ্লবের বিষময় ফল।

১৯৭৪ সালে মার্কিন কৃষি সচিব বলেছিলেন, ''খাদ্যকে আমরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি। খাদ্যশস্য আমরা মানবিক কারণে বন্টন করি না। রাজনৈতিক কারণেই করি, আমাদের পছন্দমত সরকার থাকলেই সেই দেশকে প্রয়োজনে খাদ্য সরবরাহ করি''। এরপরের ঘটনা আমরা কম বেশি জানি। বিশেষ করে সবুজ বিপ্লবের বিষময় ফল।

২০০৫ সালে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের এক কৃষি বাণিজ্য চুক্তি চালু হয় যাকে বলা হয় সংক্ষেপে এ কে আই। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্য, পঠন-পাঠন, ফসল চাষ সবকিছুই তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবে। যেন ভারতের চাষীরা চাষ করতে জানেন না। ভারতের হয়ে যাঁরা চুক্তিতে সই করলেন তাঁরা ভুলে গেলেন ভারতের ৬০% মানুষের জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতিই হল কৃষি, এক পরম্পরা। এঁরা চাষ শিখবেন আমেরিকানদের থেকে? না, আমেরিকান কৃষি পণ্য এদেশে বিক্রির সুকৌশল। ওই চুক্তির হাত ধরেই আসতে চলেছে বিতর্কিত জিন শস্যের চাষ, খুচরো পণ্যে ৫১% বিদেশী লগ্নী। ২০০৭ সালে খাদ্য দাঙ্গা হয়েছিল পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে, খাবারের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছিল। হাইতির খাদ্য দাঙ্গা ছিল উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রসংঘ ও আমেরিকা কিছুই করেন নি। দাঙ্গার জন্য পুঁজি বিনিয়োগ হবে কিংবা হবে না এই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, খাদ্য হয়ে যায় গৌণ। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা এবং কিউবার মত ছোট দেশ খাদ্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। পাতে খাবার নষ্ট হওয়ার পরিমাণ আমেরিকায় চমকে যাওয়ার মত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকায় বছরে মাথা পিছু ৯৫-১১০ কেজি খাবার নষ্ট হয় সেটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে প্রায় ৬ কেজি। ভারতে খাবার রাখার জায়গার অভাবে ২০১১-১২ সালে শুধুমাত্র পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেই যথাক্রমে ৬৬,৩০৬ ও ১০,৪৫৬ টন খাবার নষ্ট হয়। ভেবে দেখুন ভারতে না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যা কত! খাবার দেওয়ার বিভিন্ন সরকারি যোজনা থাকলেও বহু মানুষের কাছে খাবার পৌঁছয়নি।

অন্যান্য দেশের মত ভারতের উৎপাদিত খাদ্যেও সাধারণভাবে বেশী মাত্রায় কীটনাশক থাকে। খাদ্যে কীটনাশকের অবশেষ থাকার নির্ধারিত সীমা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন, তবে হেরফের অবশ্যই সামান্য। স্বভাবতই সেই সব দেশ এইসব খাদ্য আমদানি করবে না যদি তা নির্ধারিত সীমার বেশী থাকে। আবার খাদ্য সাহায্য হিসাবে আমেরিকান জি এম খাদ্য আফ্রিকার বহু দেশ বাতিল করেছেন। দেশের খাদ্য সমস্যায় বহু বিতর্কিত জিন শস্য দান হিসাবে দেওয়ার জন্য আমেরিকা বহুভাবে সমালোচিত। তবে বিদেশ থেকে আমদানি করা খাদ্য নিয়ে ভারতের বিশেষ কোন নিয়ম নেই। বিশেষ পরীক্ষা হয় না। সংবাদের প্রকাশ অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা গমে কীটনাশকের অবশেষ ভারতের থেকে বেশী ছিল। বিদেশ থেকে খাদ্য আসা মানেই বিষমুক্ত এমনটা নয়। ২০০৩ সালে পোলান্ডে ভারতের পাঠানো চায়ে বেশী কীটনাশক (ইথিয়ন) থাকার কারণে ফেরত পাঠানো হয়। বুকিং এর সময় যে নির্ধারিত মাত্রায় বিষের অবশেষ থাকার কথা ওদেশে পৌঁছানোর পরও সেই মাত্রায় ছিল। বুকিং ও মাল পৌঁছানোর মধ্যে কয়েক মাসের ব্যবধানে ওই দেশের নিয়মকানুন পাল্টে যায় এবং তা ভারতের রপ্তানীকারক সংস্থাকে উপযুক্ত সময়ে জানানো হয়নি। জানানো হলেও তখন কিছু করার নেই, ততদিনে চায়ের প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়ে গিয়েছে। এইভাবে শাক সবজিও ফেরৎ এসেছে। ২০১০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের বাসমতি চালে কৃষিবিষের অবশেষ বেশী থাকার জন্য ১০০০ টন চালের বরাত বাতিল করে, সেই সঙ্গে তিন জাহাজ ট্যাঁড়শ ও আঙুর। আমেরিকাসহ বহু দেশেই জি এম ফসলে লেবেল লাগানো নিয়ে আন্দোলন চলছে। অথচ ভারত থেকে রপ্তানী করা বাসমতি চালের প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে জি এম ও ফ্রি। এখানেও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। গত বছর প্রায় ১৭০০০ কোটি টাকার বাসমতি রপ্তানী হয়েছিল (oryza.com/tags/india-rice-exports)। ভারত সরকার জি এম ধান চাষে করার অনুমতি দিলেও বাণিজ্য মন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে বাসমতি চাষের, এলাকায় পাছে বিদেশের রপ্তানীর হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ অন্য জায়গায় চাষ হলে বাসমতি ব্রান্ডের কোন সমস্যা নেই বরং ভালো, অন্য অ-বাসমতি চাল রপ্তানী হবে না কারণ ওই চালে জি এম চালের মিশ্রণ ঘটবে। বাসমতির মত পৃথিবী বিখ্যাত চাল থাইল্যান্ডের জেসমিন চাল। ওই চালে কীভাবে সামান্য পরিমাণ জি এম চালের মিশ্রণ পাওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ চাল রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালের ১লা মে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মহারাষ্ট্রের আলফানসো আম, বেগুন, করলা ও চিচিঙ্গা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওই ফসলে নাকি ক্ষতিকারক জীবাণু, পোকামাকড় আছে। তবে ভারত সরকার এ নিয়ে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। জাপান ২০১১-১২ সালে ভারতের চিংড়ি রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল চিংড়িতে ইথোক্সিকুইন মাত্রা বেশী রয়েছে। ওই রাসায়নিকটি চিংড়ির খাদ্যে আন্টি-অক্সিডেন্ট সংরক্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ওই নিয়ে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা নেই। রাসায়নিকটি মারাত্মক শারীরিক ক্ষতির এখনো বিরূপ রিপোর্ট নেই। এই কারণে প্রায় ৫০% রপ্তানী বন্ধ।

খাবারে দূষণ

খাবার	উৎপাদন পদ্ধতি / প্রক্রিয়া		মন্তব্য
	আগে	এখন	
যাবতীয় ফসল ও পান	জৈব সার।	রাসায়নিক সার, বিষ ও আগাছা নাশক।	রাসায়নিক কৃষি মানুষের নানা রোগের জন্য দায়ী।
পানীয় জল ও খাদ্য	কোন বিষ ও রাসায়নিক সারের অবশেষ ছিল না।	বিষ, সার ও আর্সেনিক ও ভারী ধাতু।	সব ধরনের খাবারেই বিষের অবশেষ দেখা যাচ্ছে।
মাছ	পুকুরের ধানজমি ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জলাশয়ের মাছ	ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী করা রুই, কাতলা। সংরক্ষক দেওয়া থাকে।	কী ধরনের খাবার মাছকে দেওয়া হয় তা অজানা। কানকোর মধ্যে ইউরিয়া দেওয়া হয়।
ডিম ও মাংস	বাড়ির হাঁস ও মুরগির ডিম	পোল্ট্রির ডিম, প্রচুর অন্টিবায়োটিকের প্রয়োগ হয়।	আন্টিবায়োটিকের অবশেষ ডিম ও মাংসে, ভবিষ্যতে বিশেষ কিছু আন্টিবায়োটিকের কাজ হবে না। পশু কী খাবার খাচ্ছে সেটাও বিচার্য বিষয়।
মাংস	—	কীটনাশক	খাদ্যের মাধ্যমে প্রবেশ করে।
ফল পাকানো	কার্বাইডের ব্যবহার কমই হত।	কার্বাইড ও ইথবেল দিয়ে পাকানো হয়।	ওই দুটি রাসায়নিক শরীরের পক্ষে ভালো নয়।
মিষ্টির রং	জাফরান, কেশর রঙ রুপোর তবক।	মেটারিল ইয়েলো, কংগো বেড, ম্যালকাইট গ্রিন ও আলুমিনিয়ম তবক।	ক্যানসার সৃষ্টিকারী শিল্প ব্যবহৃত রং ও আলুমিনিয়াম তবক, চানাচুরেও দেওয়া হচ্ছে। মটরে ম্যালকাইট গ্রিন, কংগো বেড দিয়ে রাঙালু, সেদ্ধ করা করমচা (চেরীতে) বোদে করা হয়। পটল, কাঁকরোল সবুজ করার জন্য তুঁতে ও ম্যালকাইট গ্রিন।
জ্যাম, জেলী বোতলের ফলের রস	কোন রং ব্যবহার হত না। সাধারণ চিনি, দূষণমুক্ত জল। আখের রস, নুন, চিনি ও লেবুর	কৃত্রিম রং বাজারী পানীয়তে কৃত্রিম রং ও কৃত্রিম মিষ্টি স্বাদের জন্য বিতর্কিত হাই কর্ণ	খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সোডিয়াম বেনজয়েট ও প্রমাণিত আলার্জীকারক পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইট ব্যবহার হচ্ছে।
ঠান্ডা পানীয়	জল, ডাবের জল, ঘোলের প্রচলন বেশি ছিল।	ফ্রুট সিরাপ ও আসপারটামে।	ব্রান্ডেড পানীয়তেও কীটনাশকের অবস্থিতি পাওয়া গিয়েছে, কৃত্রিম মিষ্টি ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ।
ছানা কাটানো	লেবুর রস, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট।	কোন ক্ষেত্রে মিইরেটিক অ্যাসিড ব্যবহার হচ্ছে।	পেটের গণ্ডগোল।
প্রাতরাশ	মুড়ি, চিড়ে, মোয়া, খই, ছাতু, ফ্যানভাত, পান্তা, রুটি, লুচি আগে ছিল।	কর্ণ ফ্লেক্স ও প্যাকেটের দুধ, চাউ, ইন্সট্যান্ট চাউ, পিৎসা, চিলি চিকেনের চল বেড়েছে।	টক স্বাদের জন্য ক্যানসার সৃষ্টিকারী নিষিদ্ধ যৌগ আজিনামোতো ব্যবহার হচ্ছে।
ব্যবহৃত পাত্র	মাটি, লোহা, কাঁসা ও পিতল।	আলুমিনিয়াম, স্টীল, প্লাস্টিক, নন স্টিক প্যান, মেলামাইন বাসন।	প্লাস্টিকের বিষক্রিয়া গরম খাবারে, চায়ে চলে আসে, তাছাড়া আধুনিক পাত্রের রান্না স্বাস্থ্যকর নয়।
জ্বালানী	ঘুটে, কাঠ, কয়লা, হিটার, গ্যাস।	গ্যাস, মাইক্রোওভেন, ইনডাকশান হিটার।	মাইক্রোওভেনের স্বাদের কারণে রাশিয়াতে ১৯৭৮ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, এতে রান্না আগুন
দাঁতের যত্ন	ঘুটের ছাই, নিম ও শ্যাওড়া দাঁতন।	পেস্ট ও বিভিন্ন রকমের ব্রাশ।	দ্বারা হয় না।
দই	দই	আইসক্রিম	এত কিছু ব্যবহারের পর দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা বেড়েছে। আইসক্রিমে বহু কৃত্রিম জিনিষ ব্যবহৃত হয়।

দুধ	বহু বাড়ীতে গরু, মোষ ও ছাগলের দুধ	ফ্যাট বের করে নেওয়া প্যাকেটের দুধ, গুড়ো দুধ।	অক্সিটোসিন হর্মোন দিয়ে গরুর দুধ দোয়া হয়, প্যাকেটের দুধেও অনেক সময়ে ভেজাল দেওয়া হয়। চিনে মেলামাইন পাউডার ভেজাল দেওয়া হয়েছিল।
		সয়াবিন (বিদেশ থেকে জি এম সয়াবিনের তেলও থাকতে পারে) রেপ সীড, সাদা তেল, ভেজিটেবল	বিদেশের আমদানীকৃত সয়াবিন তেল বিক্রির জন্য সরষের তেলকে নানাভাবে খারাপ প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে।
চাল	ঢেঁকি ছাটা মোটা ও সরু দেশী ধানের চাল	কলে ছাটা পরিষ্কার রাসায়নিক সার ও বিষদ্বারা প্রস্তুত আধুনিক জাতের চাল।	বেশীর ভাগ আধুনিক জাতের পরিষ্কার পালিশ চালের ভাল স্বাদ নেই, পুষ্টিও কম
	চৈ, পিপুল, গোল মরিচ,		ঝাল লংকা খুব কম, লংকায় ঝাল হবে

পাঠকের করণীয় ঃ উপরের তালিকাটি পড়ে পাঠক নিশ্চয় ঘাবড়ে যাবেন। শহরে খাবারটাই আমাদের বড় শত্রু, খাবার থেকেই যত রোগ ভোগ। শহরের মানুষকে দ্রুত ও বেশী পরিমাণে খাবার সরবরাহ করাই হল আধুনিক রাসায়নিক কৃষির একটা বড় উদ্দেশ্য। তবে এটা বাস্তব, প্রাথমিকভাবে ধাক্কা লাগলেও এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় আছে। সবাই তো আর নিজের ফসল ফলাতে পারবেন না। প্রবন্ধ থেকে পাঠক একটা ধারণা পাবেন তবু সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। সেগুলি হল—

১) খাদ্যাভাসের সামান্য পরিবর্তন করতে হবে। দেশজ ফসলের উপর জোর দেওয়া। সারা বছর নানা ধরনের সবজি পাওয়া যায়। অসময়ের ফসল না খাওয়াই ভালো। সবজি হিসাবে ফুল অনেক রয়েছে। মোচা ছাড়া বকফুল, কুমড়ো ফুল, সজিনা, বাঁদরলাঠি, যুক্তি ফল (বসন্তকালে হয়) ও নোংরা জায়গায় জন্মানো কচুরি পানা, গাঁদা ইত্যাদি। কার্বাইড পাকানো ফল, পোল্ট্রির ডিম, কয়েকদিনের বরফের মাছ, প্রসেসড মাংস যথা সম্ভব পরিহার করা।

২) টমাটো, বেগুন, ঢ্যাড়শ ও পটলে প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার হয়। এই ফসলগুলি কম খাওয়া যেতে পারে। সবজি কেটে সামান্য বেকিং পাউডার জলে দিয়ে কাটা সবজি ২০-২৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে। বেশীর ভাগ কৃষি বিষ ক্ষারীয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয়। ফলে অনেকটা বিষ বেরিয়ে যায়। এতে জলে দ্রাব্য ভিটামিন বেরিয়ে গেলেও বিষমুক্ত করা জরুরী। কেউ কেউ পোকা বেগুন কিনে থাকেন কারণ ওতে হয়ত কৃষক বিষ দেয়নি বা অল্প দিয়েছেন তাই পোকা লেগেছে। বাস্তবে এটাও হতে পারে আবার বিষ দেওয়ার ফলে পোকা প্রতিরোধ শক্তি এতটা জন্মেছে যে পোকা আর বিষে মরছে না তাই পোকা লেগেছে। বেগুন নিয়ে কৃষি বিষের উপস্থিতির পরীক্ষা করলেই জানা যাবে, তবে সেটা অনেক ব্যয়সাপেক্ষ। জৈব খাদ্যের উপর জোর দেওয়া। জিন শস্যের ভয়াবহতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩) ঢেঁকি ছাটা বা হাস্কিং মিলের দেশী চাল খাওয়া অভ্যাস করা। সেইসঙ্গে প্রাতরাশে মুড়ি, টক দই ও চিড়ে, মুড়কি, রুটি, ইডলি খাওয়ার কথা ভাবতে পারেন।

৪) রঙ ও তবক দেওয়া খাবার, মিষ্টি, আইসক্রিম, অতিরিক্ত মাংস ও ডিম, ঠান্ডা পানীয় বর্জন করা।

৫) থার্মোকল ও প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহার না করা, প্লাস্টিকের কাপে চা বা গরম কিছু না খাওয়া।

৬) বিতর্কিত নন স্টীক প্যান, মাইক্রোওভেন ব্যবহার না করা।

৭) বিদেশের প্রসেসড ফুড না খাওয়া, খাবারে সন্দেহজনক কিছু থাকলে তা পরিহার করা।

৮) স্টীলের রান্নার পাত্র ছেড়ে লোহার পাত্রের ব্যবহার।

৯) বাড়ির ছাদে ও বারান্দায় টবে কিছু সবজি চাষ করা - বিশেষত লংকা, উচ্ছে, লাউ, কুমড়ো, টমাটো, বেগুন, মুলো, বরবটি, পুঁই, পালং, ধনে পাতা। এর থেকে সারা বছরই কিছু না কিছু বিশুদ্ধ সবজি পাবেন। কিউবাতে বাড়ির ছাদে চাষ করা বাধ্যতামূলক। কিউবাতে পুরো দেশেই জৈব উপায়ে চাষ হয়। স্কুল, কলেজ, মিউনিসিপালিটি সব জায়গায় জৈব চাষ হচ্ছে। ইদানিং বহু দেশেই ছাদে চাষ (রুফ টপ গার্ডেনিং) বাড়ছে। মাটি ছাড়া শুধুমাত্র জল দিয়েই সবজি চাষ করা যায় তার সংগে মাছ চাষ (আকোয়াপনিক্স / হাইড্রোপোনিক্স)। ছাদে যাতে চাপা না পড়ে সেই জন্য ছোবড়ার (কয়ার পিথ) হালকা মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। এটার একটা নান্দনিক দিকও আছে, প্রত্যক্ষ করা যায় কিভাবে কী কী পরিচর্চার মাধ্যমে সবজি নিজের চোখের সামনে বড় হচ্ছে। শিশুসহ শহরের সকলের কাছে এটা যথেষ্ট আনন্দের।

১০) সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, এটা গতানুগতিক পথ ছেড়ে অন্য ভাবনার দিকে যাওয়া বলেই প্রথম প্রথম কিছু মানুষ অবজ্ঞার চোখে দেখবেন। পরিতাপের বিষয়, এই নিয়ে এখনো কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা তৈরী হয়নি। চিকিৎসক সমাজ যদি এগিয়ে এসে বলেন বিশুদ্ধ জৈব খাদ্যই সুস্থ থাকার চাবিকাঠি, গণমাধ্যমে ভুল বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, সবুজ বিপ্লবের লীলাক্ষেত্র পাঞ্জাবের ভাতিন্ডার গ্রামে ঘরে ঘরে ক্যানসারের কথা তুলে ধরেন, রাসায়নিক কৃষির থেকে মানুষের অসুস্থতা বাড়ছে, তাহলে অনেকটাই সমাজের সুস্থ পরিবর্তন হতে পারে। সেই সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি মানা অযথা অবৈজ্ঞানিক ঔষধ না খাওয়া ও অবৈজ্ঞানিক টীকা না নেওয়ার কথাও বলা প্রয়োজন। হাসপাতাল, সরকারী কার্যালয়ের স্কুল কলেজের পড়ে থাকা জমিতে সামান্য হলেও কিছু চাষ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। চাষ করাটা যে নিকৃষ্ট পেশা নয়, তা চাষ করেই সচেতন করতে হবে। সুস্থ থাকাটা শুধু চিকিৎসকদের উপর নির্ভর করে না। পরিবেশ, সুখাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরিমিত ব্যায়াম ও জীবনযাত্রার উপর নির্ভরশীল। এর জন্য সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন যদি এই পৃথিবীটাকে নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য রাখতে হয়।

তুলাইপাঞ্জীর আসল-নকল

চিন্ময় দাস

উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ব্লকের কাঞ্চননদী সংলগ্ন অঞ্চলের তুলাইপাঞ্জী ধানের চাল স্বাদ ও সুগন্ধের জন্য এখন জগৎ বিখ্যাত। প্রসঙ্গত অনেকেই বলেন মোহিনীগঞ্জের তুলাইপাঞ্জী। কথাটা ভুল, আসলে মোহিনীগঞ্জের হাটে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উৎপাদিত তুলাই বিক্রি হয় সে থেকেই অনেকে ভাবেন বা বলে থাকেন মোহিনীগঞ্জের তুলাই। কাঞ্চননদীর অববাহিকা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কাঞ্চন কুলিকের একটি শাখা নদী হিসেবে বাংলাদেশের পঞ্চগড় থেকে বার হয়ে শিয়ালতোরের কাছে নাগরের সাথে মিশেছে। কাঞ্চননদীর জল কাঁচের মত চকচকে ছিল বলে এর আরেক নাম কাইচ। নদী অববাহিকা অঞ্চলের মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী বলে এই অঞ্চলে বেলে-দোঁয়াশ মৃত্তিকা দেখা যায়। মাটিতে সিলিকার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী বলে এই মাটি কিছুটা আম্লিক এবং মৃত্তিকায় ph-র মান ৬.৬-র কাছাকাছি। এছাড়া বৃষ্টিপাত ও উত্তর দিনাজপুরের বিশেষ জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলে লম্বা শুংযুক্ত এই সুগন্ধী ধান ভালো হয়। তুলাইপাঞ্জী যথেষ্ট স্পর্শকাতর ধান। সাধারণত জৈবসারেই চাষ হত। চিকন এই ধান বিঘায় ৫-৮ মণের বেশি হয় না। '৯০ সালের পর থেকে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়তে শুরু করায় এর গুণমান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। যে জমিতে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক দেওয়া হয়নি সেই জমিতেও অন্য জমির রাসায়নিক ও কীটনাশক সেচের জলের মাধ্যমে বা বৃষ্টি ও বন্যার জলের মাধ্যমে এসে মেশে। সে কারণে খুব কম জমিই রাসায়নিক ও কীটনাশকমুক্ত রয়েছে। রাসায়নিকের প্রয়োগের ফলে গাছের বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে চালের দানার ঘনত্বও বাড়ছে ফলে ফলনও কিছুটা বাড়ছে। কিন্তু দানার ঘনত্ব বাড়ার মানে হল চাল মোটা হয়ে যাওয়া। এছাড়া আমরা জানি ধান স্ব-পরাগী। কিন্তু তুলাইপাঞ্জীর পাশের জমিতে যদি অন্য প্রজাতির ধান চাষ হয় তাহলে বাতাস ও কীটপতঙ্গের দ্বারা পরাগ সংযোগের সম্ভাবনা থাকে ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তুলাই তার নিজস্বতা হারাচ্ছে।

বীজ রাখার সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যে জমি থেকে বীজ রাখতে হবে সেখানে প্রথম থেকেই সর্তক থাকতে হয়। প্রথমে বীজ ধান বাছাই ও শোধনের পর বীজতলায় ছেটাতে হবে। এরপর চারাগাছ রোপনের পর জমিতে ধানগাছ কিছুটা বড় হলে যেগুলো অন্যপ্রজাতির ধান বা বন্যধান (wild rice) সেগুলো পর্যন্ত অতি সন্তর্পণে তুলে ফেলতে হবে। বীজ রাখার সময় জমির মাঝখান থেকে বেছে বেছে সর্বোচ্চ বিকাশপ্রাপ্ত ধানের ছড়া (pinacle) সংগ্রহ করতে হয়। যারা সচেতন চাষী তাঁরা অনেকেই উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে অবগত এবং কম-বেশী প্রয়োগ করেন। এখানেও একটা কিন্তু রয়ে গেছে কারণ আজকাল চাষীরা বীজধান সংরক্ষণ করার বদলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দোকানের ওপর নির্ভরশীল। আর দোকানের মালিকের ধানের বিশুদ্ধতা রক্ষার দায় নিতে বয়েই গেছে তার তো ব্যবসা নিয়ে কথা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপনে খরচ করবেন।

এছাড়া কিছু চাষী আছেন যারা আবার জেনে বুঝেই তুলাইকে ধ্বংস করে যাচ্ছেন ফি বছর। অতি লাভের আশায় লোভের বশবর্তী হয়ে তুলাইয়ের বীজের সাথে এলাই বা শোভা বা কখন কখন শম্পা মাসুরির বীজ মিলিয়ে বীজতলা তৈরী করে রোপা বুনছে। এতে হয়তো আপাত দৃষ্টিতে ফলন বেশি দেখাচ্ছে কারণ অন্য ধানগুলির ফলন তুলাইয়ের চেয়ে বেশি আর এক সাথে মিশে থাকার জন্য বাজারে দামও পাওয়া যাচ্ছে ভালোই। কিন্তু এতে করে তুলাই আর তুলাই থাকছে না। cross pollination হওয়ার কারণে তুলাই মোটা হয়ে যাচ্ছে, গন্ধ কমছে। এই পর্যন্ত থাকলেও ঠিক ছিল কিন্তু যখন বেশি ফলনের আশায় ওই ধানই কোন চাষী পরের বছর বীজধান হিসেবে ব্যবহার করছে বিপত্তিটা ঘটছে তখন, কারণ সে ধান তো আর বিশুদ্ধ তুলাই নয়। তুলাইয়ের অনেক বৈশিষ্ট্যই তার নষ্ট হয়ে গেছে। মজার বিষয় হল আসল তুলাই ভেবে সেই বীজই কেউ যদি পরের মরশুমগুলোতে চাষ করতে থাকে তবে বছর দুই পর ওই ধানে তুলাইয়ের কোন বৈশিষ্ট্য থাকবে সেটাই বড় জিজ্ঞাসার। আর সেই কারণেই ইদানিংকালে এই অঞ্চলের অনেক তুলাই ধানেই আর শুং পাওয়া যাচ্ছে না। এভাবেই বীজের জিনগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছে আসল তুলাইপাঞ্জী।

এবার আসা যাক যারা ধান থেকে চাল তৈরী করে অর্থাৎ কুটিওয়ালা, বিক্রেতা এবং সর্বোপরি ভোক্তাদের কর্মকান্ড নিয়ে। আগেই বলেছি তুলাইপাঞ্জি খুব স্পর্শকাতর ধান। ধান থেকে চাল তৈরী করতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই চাল ভেঙে কয়েক ভাগ, সেই চাল অর্ধেক দামেও নেবে না কেউ। ফলে কুটি মালিকদের ঝুঁকি এই ধানের ক্ষেত্রে অনেক বেশী। তাই অনেকক্ষেত্রেই কুটিমালিকেরা ছল-চাতুরির আশ্রয় নেয়। সে গল্পে পরে আসছি। আগে ভোক্তাদের কথায় আসি। আমরা সবাই চাই বাজারের সবচেয়ে ভালো জিনিসটা খাব সবচেয়ে কম দামে। ঠিক একই রকম আমরা চাই সুগন্ধী তুলাই যা হাত দিয়ে মুঠো করে ধরলে আলতো মোলায়েম থাকবে। কিন্তু

দাম হলে ৭০-৮০'র মধ্যে। মুশকিলটা হল ওই দামে আসল তুলাই কখনও পাওয়া সম্ভব নয়, তার কারণ নিহিত আছে এর উৎপাদন খরচে। বর্তমানে রায়গঞ্জ ব্লকের মোহিনীগঞ্জ, বিন্দোল, মহারাজা, বারদুয়ারী, কমলাবাড়ি হাটে ভাল তুলাই ধান কিনতে গেলে ৪০ কেজি (এক মণ) ধানের দাম পড়ে ১৬০০ টাকা। এক কুইন্টালের দাম পড়ে ৩৬০০-৪২০০ টাকা। ৪০ কেজি ধান থেকে ২৪-২৬ কেজি চাল হয়। তাহলে ধরা যাক ২৫ কেজি চালের দাম ১৬০০ টাকা। এর সাথে ধান কোটা, সেদ্ধ করা এবং ঝাড়ার জন্য যদি আরো ৪০০ টাকা খরচ হয়। তবে ২৫ কেজি চালের উৎপাদন খরচ হবে ২০০০ টাকা। অর্থাৎ কেজি প্রতি দাম হবে ৮০ টাকা। এবার বলুন তাহলে পাইকার, খুচরো বিক্রেতা এবং উৎপাদক কে, কত লাভ করবে?

এবার আসা যাক বাজারের কথায়। রায়গঞ্জের মোহনবাটী বাজারে তুলাই পাওয়া যায়। এবং সব দোকানদারের কাছেই সেই দাম ৭০-৯০ টাকার মধ্যে। দর-দাম করে ৮৮ টাকা দরে আপনি চাল কিনলেন। চালে গন্ধ একটা পাবেন, মোলায়েম ভাবও থাকবে। কিন্তু আতস কাঁচের নীচে যদি একমুঠো চাল নিয়ে দেখে তবে দেখবেন ১০% চাল ভাঙা, ২০% মাথাকাটা একটু মোটা চাল কিন্তু আকার তুলাইয়ের মত আর ৫% অন্য চাল সহজেই বুঝতে পারবেন। তাহলে কী পেলেন এক কেজি চালে ৩৫০ গ্রাম অন্য চাল। আসলে তুলাই খুবই স্পর্শকাতর ধান। সিদ্ধ করে ভাঙানোর ক্ষেত্রে একটু অসাবধানতা অবলম্বন করলেই চাল ভেঙে চৌচির। কুটি মালিকেরা ভাঙা চাল কম দামে দোকানদারদের বিক্রি করে। তাছাড়া বেশ কিছু চিকন চাল যেমন, শম্পা, শোভা, এলাই মেশানো হয়। আর এই উপায় দোকানদাররা গ্রহণ করে নিজেদের লাভের পাশাপাশি চালের দামটাও ৭০-৯০-র মধ্যে বেঁধে রাখবার জন্য।

এবার কুটি মালিকদের কারসাজির গল্প শোনানো যাক। একদিন দক্ষিণ দেবীনগরের এক কুটি বাড়িতে গিয়ে দেখি শোভা ধান দু'বার করে হলারে দেবার পর সেগুলি এক জায়গায় ছড়িয়ে রাখা হল। এবং তার সাথে সাবানের গুঁড়ো, একটু হলুদ, একটু ময়দা এবং ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে আবার তৃতীয়বার হলারে তুললো পালিশ করবার জন্য। একটু পরেই দারুণ ঝকঝকে শোভা চাল তৈরী। কিন্তু তিনি ছবি তুলতে দেননি,। আমিও জোর করিনি আরো কিছু তথ্য পাবার আশায়। কুটি'র মালিকের একটি ছোট ধান ভাঙার মিলও আছে। তিনি বলেন, দেখুন দাদা ঝাড়খন্ড থেকে ধান এনে যদি একটু বেশি লাভ নাই-ই করতে পারি... তাছাড়া এগুলো না করলে বড় বড় চালকলগুলোর সঙ্গে পেরে উঠবো কেমন করে? ওরা তো যে কোনো ধানকে শোভা বা তুলাইয়ের মত চিকন করে কাটিং করে ইউরিয়া দিয়ে পালিশ করে বাজারে কম দামে বিক্রি করে। সে কারণে বাজারে টিকে থাকার জন্য আমরাও তুলাইয়ের সাথে অন্য চাল মিশিয়ে পায়েস পাতা ক'দিন রেখে কম দামের তুলাই বিক্রি করি। এতে গন্ধটাও ঠিক থাকে আর সাবানের গুঁড়ো দিয়ে পালিশ করাতে চালের মোলায়েম ভাবটাও থাকে। আর একটি বিষয় শুনলে আপনারা শুধু আশ্চর্যই হবেন না আতঙ্কিতও হয়ে পড়বেন। যখন খারাপ আবহাওয়া থাকে বা বর্ষার সময় সিদ্ধ ধানের গন্ধ দূর করার জন্য হারপিক মেশানো হয়। হ্যাঁ, আপনারা বাথরুম পরিস্কারের জন্য যে হারপিক ব্যবহার করেন তার কথাই বলছি।

কিছুদিন আগে কলকাতায় একটি মজার বিষয় লক্ষ্য করলাম, সেখানে তুলাই চাল ৬০-৬৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। চাল হাতে নিয়ে বুঝলাম ওটা শম্পা মাশুরি কিন্তু তুলাইয়ের মত গন্ধ রয়েছে। আর একটি দোকানে আবার লেখা ছিল 'এখানে মোহিনীগঞ্জের তুলাই পাওয়া যায়'। সেখানে আবার দু'ধরণের তুলাই ছিল। চালের রঙ হালকা ফ্যাকাশে, নরম ভাব নেই বললেই চলে। ওটা যে আদৌ তুলাই পাঞ্জি নয় সে ব্যাপারে নিশ্চিত। তাহলে ভাবুন বাজার থেকে তুলাই পাঞ্জি বলে যে চাল আপনি বাড়ি নিয়ে গেলেন সেটা তো তুলাই নই, এমনকি যেটা তুলাই বলে গেলেন সেটা যে কী তাও জানলেন না। এবার ভাবুন ওই চাল খেয়ে আমাদের দেহের পুষ্টি সাধনই বা কতটা হবে? এমনিতেই তুলাইয়ে বিভিন্ন খনিজ মৌলের (যেমন লোহা, জিঙ্ক ইত্যাদি) পরিমাণ অন্যান্য মোটা চাল যেমন- বহুরূপী, ঝিঙাশাল, কেরালা সুন্দরীর থেকে অনেক কম থাকে। কিন্তু বেশি এরোমা থাকায় সুগন্ধ হয় তাই খেতেও ভালো লাগে। সুতরাং বাজারের ওই তুলাই যে আমাদের সব দিক থেকেই বঞ্চিত করে সে বোধহয় আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে উত্তর দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি ধানকে শুধুমাত্র আমাদের ভুল চাষ পদ্ধতি, বেশি লাভ করবার লোভ এবং না বুঝে আমরা এমন কিছু ভুল পদক্ষেপ নিয়েছি যে কারণে এই ধানই তার গুণগত মান হারিয়ে ফেলেছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষিদপ্তরও চিন্তিত। কৃষি বিভাগ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে বটে বিশেষত তুলাইয়ের বিশুদ্ধ বীজ তৈরী করার জন্য। কিন্তু তা ততটা সফল হয়নি। কারণ যারা এই ধান চাষ করে এবং চাল তৈরী করে তারা যতক্ষণ না সততার সঙ্গে সচেতন না হচ্ছে ততদিন কিছুই হওয়ার নয়। আর এ ভাবে চলতে থাকলে এ জেলার অন্যান্য দেশজ ধানের মত তুলাইও একদিন হারিয়ে যাবে। তখন শুধু হা-হুতাশ ছাড়া আর করার কিছুই থাকবে না।

সমীক্ষা

শস্যক্ষেতে বর্গী পোকা ও আমার পৃথিবী রক্ষার হাতিয়ার

অভিজিৎ সরকার

খবরটা কিছুদিন হল ফড়িং-এর মত উড়ছিল বাতাসে। তাই কানেও এসেছিল এদিক ওদিক থেকে। কিন্তু স্পষ্ট চেহারা নিতে সময় লাগলো, যখন অনিলদার মুখে শুনলাম আব্দুলঘাটার বনাঞ্চলের আশেপাশের কৃষি জমিতে পোকার উপদ্রব বেড়ে গেছে বেশ কিছু দিন হল। জমিতে পোকার উপদ্রব তো নতুন কিছু নয়। এ এক আবহামানকালের বৈরীতার সম্পর্ক যা সঙ্গে নিয়েই মানব সভ্যতার পথ চলা। কাজেই এত বিচলিত হওয়ার তেমন বড় কারণ ছিল না। তবু কথায় কথা বাড়ে। তাই প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'বেড়ে যাওয়ার কারণ কিছু বুঝলেন।' উত্তরটা একটা ধোঁয়াশা গোছের হতে যাচ্ছে দেখে পরের প্রশ্নটি করে ফেললাম তড়িঘড়ি—'তাহলে এখন উপায়? চাষিরা কী করছে?' এবার একটা জুতসই উত্তর এল—'চাষিদের খরচা একটু বেড়ে যাচ্ছে ঠিকই, তবে বাজারে প্রচুর ভাল কীটনাশকের এখন ছড়াছড়ি। কাজেই সময় মত খেয়াল রাখলে মোক্ষম দাবাই দিয়ে পোকামুক্তিতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না।' এত সহজ একটা উত্তর আমাকে নতুন করে বড় ভাবনার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। বিষয়টা কি সত্যিই এত সহজ, এত সাধারণ! বিশেষতঃ যখন সেটা মানুষের খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। যে খাদ্য কোনো শখের খাদ্যবস্তু নয়, যাকে চাইলে আমি পরিত্যাগ করতে পারি অনায়াসে। এ তো আমার রোজকার বেঁচে থাকার ইন্ধন। ধান, গম, বেগুন, ঢেঁড়শ, আলু, পটল, কপি, ডাঁটা কি নেই তাতে। আর সেখানেই ছড়িয়ে দিচ্ছি মারণ বিষ, কার জন্য? নিজেদের ভাল খুঁজতে গিয়ে পক্ষান্তরে নিজেদের জন্যই প্রস্তুত করছি না তো নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রশস্ত জমি? ভাবনাটা আমাকে ঘামিয়ে দিয়েছিল পৌষের মাঝামাঝি সেই বিকেলে। সেদিনের সেই ভাবনাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আব্দুলঘাটার জঙ্গলে। কারণ বিষয়টায় যেহেতু জড়িয়ে গেছে আমার পরিবেশ ও আমার ভালবাসার কীটপতঙ্গরা। আমি তো কাউকেই উপেক্ষা করতে পারি না, না আমার জাত ভাইদের, না আমার পরিবেশের বৃহত্তর প্রতিবেশী গোষ্ঠিকে—কীটপতঙ্গদের। তাই বহু বছরের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে তার মাঝে দাঁড়িয়ে আমি কি ভাবতে পারিনা কোনো বিকল্প পথ? যুদ্ধকে সমঝোতায় রূপান্তরের আমার তীব্র বাসনা কি শুধু অমূলক ধারণা মাত্র? আমি যে চাই আমার এক হাতের আঙুল ধরে দোল খাক আগামী প্রজন্ম, অন্য হাতের আঙুলে গুটি বাঁধুক প্রজাপতির দল। তাই বিগত বহুদিনের মত আজ একবার এসে দাঁড়িয়েছি কুলিকের গায়ে গায়ে লেপটে থাকা এই আব্দুলঘাটার অরণ্যে। পতঙ্গদের বৃহত্তর বাসস্থানে আরও একবার পদার্পন, সমস্যার শেকড় খুঁজতে।

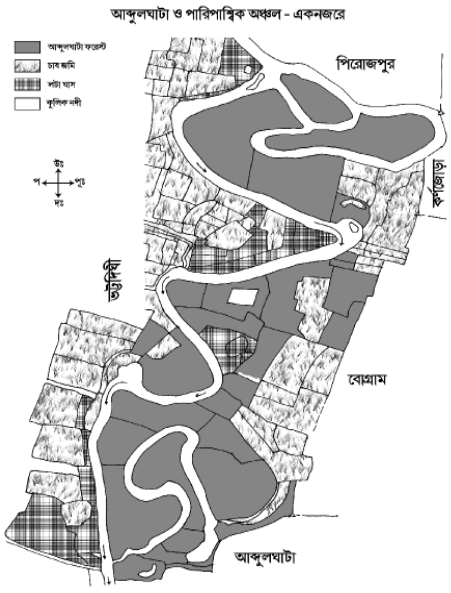

সম বা অসম যে কোনো লড়াই-এ বিপরীত পক্ষের সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা না নিয়ে এগোনো মুর্খামি। তাই এক্ষেত্রেও তার অন্যথা না করে সামান্য কিছু তথ্য সামনে রাখতেই হচ্ছে কারণ আসলে এ ভাবনা আগামীতে ভাবতে হবে সমষ্টিগতভাবে।

পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে থাকা জীবজগতের (আণুবীক্ষণিক জীব বাদে) সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে রয়েছে সন্ধীপদরা। শতকরা হিসেবে প্রায় ৫৬ শতাংশের কাছাকাছি। যেখানে এই হিসেবে উদ্ভিদ সাম্রাজ্য প্রায় ৩০ শতাংশ এবং ভাবলে অবাক লাগে সমস্ত জীবজন্তুসহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষতিকারক জীব মানুষের পরিমাণ সেই হিসেবের খাতায় প্রায় ১৪ শতাংশ মাত্র। স্বাভাবিকভাবেই বাস্তুতন্ত্রে এই সন্ধীপদদের বা বলা যেতে পারে সন্ধীপদ অন্তর্গত পতঙ্গদের (Insect) প্রবল উপস্থিতি যে অসম্ভব গুরুত্বের দাবী রাখে একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একথা বললে বোধহয় বেশী বলা হবে না যে ১০ বর্গ কিমি এলাকায় যে পরিমাণ পশু প্রজাতি রয়েছে তাদের সবাইকে একসাথে সরিয়ে ফেললে পরিবেশের হয়তো সামান্যই ক্ষতি হবে কিন্তু ওই জায়গায় সাধারণভাবে দৃশ্যমান বা দৃশ্যমান নয় এমন সমস্ত Insect-কে একসাথে সরিয়ে ফেললে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই নিজেদের চারপাশের বিপুল সংখ্যায় সমৃদ্ধ Insect-দের জীবনপ্রণালী, বাসস্থান, খাদ্যাভ্যাসের প্রতি নজরদারী পরিবেশ রক্ষার দায়বদ্ধতাতে ও মানুষ কীটপতঙ্গ সহাবস্থান সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। এমনকি তাদের খাদ্যশৃঙ্খল লক্ষ্য করে Biological Pest Control-এর হাতিয়ার মানুষের হাতেই সুরক্ষিত হতে পারে।

আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভাবতে শুরু করেছেন যে আব্দুলঘাটার বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আশপাশের জমিতে কীটপতঙ্গদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে না ভেবে আমি কিনা পতঙ্গপক্ষ সমর্থনের একটা ভিত্তিহীন প্রচেষ্টা শুরু করেছি। না বন্ধুরা তেমন একচোখা আমি নই। আসলে আব্দুলঘাটার বনভূমিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ, পাখি, পোকামাকড় এবং পশুসহ সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী মনুষ্যকূলকে নিয়ে যে জীববৈচিত্র্য রয়েছে সেখানে মানুষের পক্ষে অপকারী Insect ও মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান অপরিহার্য খাদ্য ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক Insect দের সহাবস্থানের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষিত হতে পারে এবং ক্ষতিকারক কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়া শুধুমাত্র ওই এলাকার Insect দের খাদ্যখাদক সম্পর্কের ওপর নজর রেখে কী করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে এ ভাবনার শুরু ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে আমার চিন্তায়। তাই এই সবুজের

মাঝে দাঁড়িয়ে আমার বহু বছরের পর্যবেক্ষিত ঘটনাগুলিকে এক সুতোয় গেঁথে তুলতে চাইছি আজ।

১৯৯৮ সালের আশপাশ থেকে এই অরণ্যের পোকামাকড়ের সঙ্গে আমার সখ্যতা গড়ে ওঠে। যদিও প্রথমে ফটোগ্রাফীর কারণে হলেও আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে পতঙ্গদের জীবন প্রণালীতে কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তাদের নানা জীবন সংগ্রামের মুহূর্তের সাক্ষী হতে শুরু করি। ফলে আশ্চর্য হয়ে দিনের পর দিন দেখে গেছি একজনকে অন্যজনের ভক্ষক হতে এবং এই খাওয়া-খাওয়ির ছক জুড়তে জুড়তে একসময় এক বৃহৎ খাদ্যজালের হদিশ আসে আমার নজরে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি সেই খাদ্যজালের একদিক উদ্ভিদের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিক স্তন্যপায়ীর রক্তের সঙ্গে জুড়ে গেছে অবলীলায়। আর মাঝখান জুড়ে পতঙ্গরা বা পাখি একে অপরকে খেয়ে বেঁচে আছে। ফলে এই বিষয়টি আজ আমার কাছে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে বিশ্লেষণের জন্য। কোথায় যেন লুকিয়ে থাকতে পারে আব্দুলঘাটার আশেপাশের কৃষি জমিতে পোকামাকড় বেড়ে যাওয়ার কারণের ইঙ্গিত। এই খাদ্যজালের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগবিন্দুতে পাখিকে রেখে দৃষ্টি প্রসারিত করলেই দেখা যাবে মূলতঃ আঞ্চলিক পাখিদের মধ্যে গ্রীন বি-ইটার, ব্লু জে, ওয়র্বলার, ড্রঙ্গো, কুবো, ব্রাউন স্রিক, ব্ল্যাক হেডেড ওরিওল, উডপেকার ও ক্যাটেল ইগ্রেটদের খাদ্য তালিকা জুড়েই রয়েছে Odonata, Lapidoptera, Hymenoptera, Diptera, Orthoptera ইত্যাদি Order এর Insectগুলি। কাজেই বনভূমিতে Insect নির্ভর এইসব পাখিরা Ecological Balance রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বসে রয়েছে। আর ভেবে দেখুন এইসব পাখিদের এখন আমরা কতটুকুই বা দেখতে পাই আমাদের চারপাশে। পাখিগুলো তবে গেল কোথায়— এ প্রশ্ন কি স্বাভাবিকভাবেই মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে না? যে অরণ্যে এদের বাসস্থান সেখানকার পরিবেশ নষ্টই কি এর কারণ হতে পারে না? অন্যদিকে বিভিন্ন রাসায়নিক সার বা ওষুধের প্রভাবকে কী করে অস্বীকার করি যখন আমরা জেনে গেছি শকুনের ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ পশুদের ব্যথানাশক হিসেবে প্রয়োগ করা Diclofenac নামক ওষুধটি। এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে Insect-রাও কি খুব সুখে রয়েছে এখানে? মুখ ফসকে এই প্রশ্নটি করে এবার বোধহয় আমি বেকায়দায় পড়তে চলেছি। কারণ আপনারা সমস্বরে সবাই ধমকে উঠবেন এই বলে যে 'আবার সেই পতঙ্গদের ভালো মন্দ বিষয়ের আলোচনা শুরু?' অথচ কথা ছিল কৃষিক্ষেত্রে পোকার বাড়বাড়ন্তের কারণ খোঁজা। আমার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সংশয় ক্রমশ বাড়ছে বুঝেও বলবো আমাকে আরও কিছুটা সময় ভাবতেই হবে এই অরণ্যের ঝোপে-জঙ্গলে মাথা গুঁজে বসে থেকে।

মানুষের একটা বড় অংশ সবসময়েই পরিবেশের উপরে সরাসরি নির্ভরশীল। পরিবেশের বিভিন্ন সম্পদ আহরণ করেই অসংখ্য মানুষের জীবন ও জীবিকা টিকে থাকে। আর এই নির্ভরশীলতার প্রশ্নে আব্দুলঘাটার বনসংলগ্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীও পিছিয়ে নেই। বন লাগোয়া দক্ষিণ আব্দুলঘাটার ২৪টি পরিবারের আর্থিক উপার্জন ও তৎসহ অর্থনৈতিকভাবে বন নির্ভরশীলতা বিষয়ে আমার করা বেশ কিছুদিন আগের একটি সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে দেখেছি পরিবারগুলির মাসিক গড় আয় ১৬৮০.০০ টাকা এবং মাথাপিছু গড় আয় ৩৫৩.৫০ টাকা। কাজেই আর্থিকভাবে দুর্বল এই জনগোষ্ঠী ও তৎসহ ৩ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে বসবাসকারী অন্যান্য অঞ্চল যেমন ভট্টদিঘি, বোগ্রাম, পিরোজপুর, খরমুজাঘাট ও সুদর্শনপুর এলাকার মানুষদের বনজ সম্পদ ভোগের যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে ওই এলাকার Insect-দের জীবনপ্রণালী বিঘ্নিত হচ্ছে। এইসব মানুষেরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারে উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে পাতা এই অরণ্য থেকে সংগ্রহ করে। শুধু দক্ষিণ আব্দুলঘাটার ২৪টি পরিবারই বছরের একটা বড় সময় সপ্তাহে গড়ে ৯২০ কেজি পাতা এবং এই হিসাবে মাসে গড়ে ৩৬৮০ কেজি পাতা সংগ্রহ করে। পাতা ঝরার ঋতুতে এই পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি। আগে বর্ণিত এলাকাগুলির সমষ্টিগত সংগ্রহের পরিমাণটি নিশ্চয়ই এ থেকে অনুমেয়। কাজেই গাছের নিচের মাটিতে পাতা পচে মিশে যাওয়ার সুযোগ না থাকায় একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে পচা পাতার নীচে বাবাসকারী Insect রা নিরুপদ্রব বাসস্থান হারিয়ে গৃহহারা হয়ে পড়ছে। বেসামাল হয়ে পড়ছে মাটিতে বসবাসকারী Diplopoda এবং Chilopoda Class-এর অনেকে, যেমন— কেন্নো, তেঁতুলবিছেরা। এদের সংখ্যা হ্রাস, খাদ্য পিরামিডের উপরের দিকে থাকা বৃহত্তর খাদকদের টিকে থাকাতেও কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিচ্ছে। Insect নির্ভরশীল Blue jay, Brown Shrike, Green Bee eater পাখিগুলি ক্রমশ কমে গেছে। এই অরণ্যে ১৯৯৮ সালের পর থেকে একটি Blue Jay বা নীলকণ্ঠ পাখি চোখে পড়েনি।

সারণী - ১
যে সব Insect মানুষ ও পশুদের মধ্যে রোগ ছড়ায়

No.	Order	Pest or Vector	Injury or Disease
1.	Dictyoptera	Cockroaches	Sometimes mechanical transport of Pathogens.
2.	Hemiptera	Bed bugs	Loss of blood through bites.
		Kissing bugs	Painful bites around mouth; vector of Changas disease in New World tropics
3.	Mallophaga	Chewing lice	Ectoparasites of birds and mammals; heavy infestations my cause death through secondary infection.
4.	Anoplura	Sucking lice	Ectoparasites of man and mammals; vectors of diseases; may cause serious dermatosis.
5.	Diptera	Mosquitoes	Irritating bites; vectors of many diseases including malaria and yellow fever.
		Black flies	Irritating bites; vectors of diseases.
		Deer flies	Vectors of serious eye disease.
		Tsetse flies	Vectors of African sleeping sickness.
		Sand flies	Vectors of several tropical diseases.
		House fly	Vectors of amoebic dysentery; typhoid; cholera.
		House flies	Vectors of anthrax.
		Blow flies	Vectors of typhoid and cholera
6.	Siphonaptera	Fleas	Vectors of epidemic typhus and plague.
7.	Hymenoptera	Bees, ants, wasps	Some species inflict painful stings.

জ্বালানীর খরচ সাশ্রয় হিসাবে পাতা সংগ্রহের পাশাপাশি তাদের বেশিরভাগ বাড়িগুলি কাঁচা হওয়ায় বন থেকে কচি বা বড় ঘাস তারা কিছুটা জ্বালানী ও কিছুটা ঘরের বেড়া অথবা চাল ছাওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে থাকে। কাজেই জঙ্গলের বিরাট অংশের ঘাস প্রমাণ মাপের হওয়ার আগেই প্রয়োজন অনুপাতে কাটা হয়ে যায় আর এই ঘাসবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা Lepidoptera, Coleoptera, Odonata, Diptera, Dictyoptera, Orthoptera প্রভৃতি Order এর পতঙ্গরা বিরাট সংখ্যায় বাস্তুহারা হয়ে পড়ছে। আধুনিক জীবনযাত্রায় অপ্রয়োজনীয় গুল্ম উদ্ভিগুলি (আগাছা) উচ্ছেদ বা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রয়োগে আগাছা দমন করতে গিয়ে সেইসব নির্দিষ্ট উদ্ভিদে বাসবাসকারী Insect দেরও ঘরছাড়া করার ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য নতুন সমস্যার জন্ম দিতে পারে

এ বিষয়ে ভাবার প্রয়োজনবোধই করিনি আমরা।

এছাড়া আরও একটি বিষয় আমাকে চমকে দিয়েছে ঘনঘন। মাত্র ১৫ দিন আগেও যে গাছের নিচে বসে লক্ষ্য করেছি পতঙ্গদের গেরস্থালী আজ হঠাৎ সেখানকার শূন্যতা আরও এক ভাবনার সম্মুখীন করছে অনিবার্যভাবে। একের পর এক গাছ কাটা চলছে লুকিয়ে বা প্রকাশ্যে। জঙ্গলের পরিধিতে কিছু গাছ সাজানোর মতে রয়ে গেলেও প্রতিদিন প্রতি রাতে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলের ভেতরের বৃক্ষগুলি মানুষের লোভের পরিণতিতে। আব্দুলঘাটার বনভূমিতে সাধারণের অবাধ প্রবেশের দরুণ এবং বনদপ্তর কর্তৃক উপযুক্ত পাহারার পরিকাঠামো না থাকায় মানুষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গাছের ডাল ভেঙে জ্বালানীর চাহিদা মেটান, পাশাপাশি গাছের ছাল ওষধি হিসাবে তুলে নেওয়ায় অনেকগাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও পরবর্তীতে মারা যাচ্ছে। এ বিষয়ে অর্জুন গাছের নাম করতেই হয়।

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি এবার আপনাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করেছে। কারণ ফসলের ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে শুরু করে আমি এমন কতগুলি বিষয় নিয়ে নাড়াঘাটা শুরু করেছি যাতে মনে হতেই পারে যে মাথার ব্যথার কারণ খুঁজছি পেটের ডাক্তারের কাছে গিয়ে। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি নিরুপায়। কারণ যে পোকাদের নিয়ে এ সমস্যার সূত্রপাত তারা তো কোনো অন্য গ্রহ থেকে আসেনি। আবহমান কাল থেকেই এই শস্যক্ষেত, বাড়ির আনাচে কানাচে, গুল্মে-বৃক্ষে বসবাস করে আসছে মানুষের প্রতিবেশী হয়ে। তাহলে আজ কি তারা বেশী পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করছে নাকি তাদের মূল বাসস্থানে টান পড়ছে। Insectদের জীবনচক্র যেমন খুব অল্প সময়ে আবর্তিত হয় তেমনই তাদের মৃত্যুর হারও বেশী তাই শস্যক্ষেত্রে তাদের বৃদ্ধির কারণ কি দ্বিতীয় কারণটির দিকেই আঙুল তুলছে না? বাস্তুহারা হয়ে তারা কি আজ নিজভূমে পরবাসী নয়? ভাবুন ভাবুন, আরও একবার নতুন করে ভাবুন। এই অরণ্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে চোখ রাখুন আর ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে কোথাও কি একাত্ম করে নিতে অসুবিধে হচ্ছে এই নিরুপায় পতঙ্গদের?

আব্দুলঘাটা অঞ্চলের উষ্ণতা, আর্দ্রতা তৎসহ জলাভূমির উপস্থিতি বৃক্ষ, গুল্ম, লতানো গাছ ও সর্বোপরি ঘাসবন বিভিন্ন ধরনের Insect দের প্রিয় বাসস্থান হয়ে উঠেছিল খুব সহজেই। আর এই বনভূমির চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র। কাজেই এই বনভূমিতে যখনই নানা কারণে Insectদের বাসস্থানে টান পড়েছে তখনই তারা প্রান্তিক মানুষের মত সরে এসেছে পার্শ্ববর্তী শস্যক্ষেত্রে। মানুষের পরিকল্পনাহীন বন নির্ভরশীলতার যে উদাহরণ আমি কিছুক্ষণ আগেই আপনাদের বলে আপনাদের বিরক্তির কারণ হয়েছি, কারণগুলি এবার নতুন করে ভেবে দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

এই বনভূমিতে যে সব Insect রয়েছে তাদের মূলত দুটো বড় ভাগে ভাগ করে আলোচনাকে এবার একটু গুটিয়ে আনতে চেষ্টা করি। আসলে লাভক্ষতির হিসাব পৃথিবীতে যেহেতু মানুষের সাপেক্ষে এবং মানুষের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাই সেই হিসেবে সমগ্র পৃথিবীতে Insect রা দুটো ভাগে বিভক্ত। ক) মানুষ বা পশুর ক্ষেত্রে সরাসরি ক্ষতিকারক (সারণি১) এবং খ) উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক (সারণি-২) মানুষের পক্ষে সরসরি ক্ষতিকারক Insect দের Order মূলত ৭টি। এদের অন্যতম মশা যা সরাসরি রোগের বাহক যেমন তেমনই রক্ত খাওয়ার কারণে মানুষের যন্ত্রণার কারণও বটে। কাজেই মুক্তিলাভের সহজ উপায় হিসেবে মশানাশক কয়েল বা স্প্রে, ডিডিটি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ছে প্রতিদিন। কিন্তু মশানাশক কয়েলে ব্যবহৃত অলেথ্রিন (Allethrin) নামে রাসায়নিকটি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। কেউ কেউ আবার মশার লার্ভা নিধনে গাপ্পি, তেলাপিয়া, চায়না মাগুরের চাষের কথা আগেই বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন একটা রয়েই গেছে যে ড্রেনে বা ছোট ছোট কাদা জল ভরা গর্তে কী করে ঐ সব মাছ চাষ সম্ভব? তাছাড়া যেসব লার্ভারা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উড়ে গেছে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা ভাবা যাবে? কাজেই আমার পর্যবেক্ষিত আব্দুলঘাটা বনভূমির ফুড চেইনটি (প্রবাহ চিত্র ১) লক্ষ করলেই দেখা যায় মশার Predator সরাসরি ভাবে Damselfly (সরু ফড়িং) রা। কাজেই এই ফড়িংদের সংখ্যা হ্রাস মশা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ যেমন তেমনই এই ফড়িংদের সংখ্যা বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ হারিয়ে যাওয়ার পেছনে নিজেদের ভূমিকাটিকে আর কতদিন উপেক্ষা করবো বলতে পারেন? তেমনই ছারপোকা, বোলতা, ডাঁশ মাছি, আরশোলা এমন অনেক মানুষের পক্ষে সরাসরি ক্ষতিকারক Insect দে সংখ্যা বৃদ্ধি আসলে তাদের খাদ্য জালটির ক্ষতি বা কোনো কোন অংশ ভেঙে যাওয়ার দিকেই তো সরাসরি ইঙ্গিত করে। আর এই ভারসাম্য হারানোতে প্রধান ভূমিকা যে আপনি বা আমি অত্যন্ত বালখিল্যভাবে নিয়ে ফেলেছি অথবা ফেলছি প্রতিদিন একটু একটু করে তা তো অস্বীকার করার আর উপায় নেই বন্ধুরা।

সারণী - ২
যে সব Insect উদ্ভিদের ক্ষতি করে

No.	Order	Pest or Vector	Injury or Disease
1.	Orthoptera	Grasshoppers, Crickets, Katydids	Nymphs and adults feed on leaves
2.	Hemiptera	Plant bugs, Seed bugs.	Nymphs and adults damage stems, leaves, flowers, and seeds.
3.	Homoptera	Aphids, Cicadas, Scale insects, Whiteflies, Tree-hoppers, and Leafhoppers	Piercing-sucking mouthparts damage all parts of the plant; vectors of plantx parts of
4.	Thysanoptera	Thrips	Mechanical damage to leaves and flowers; plant disease vectors.
5.	Coleoptera	Beetles and Weevils	Grubs cause root damage; adults and larvae attack of parts of the plant; seed infestation by many
6.	Diptera	Flies	Leaf miners; gall formation
6.	Hymenoptera	Sawflies, Gall makers, Webspinners	Larvae of some are leaf feeders; webspinners cause leaf damage.
7.	Lepidoptera	Moth and Butterfly	Caterpillar damage to all parts of the plant, including flowers and seeds.

অপরদিকে উদ্ভিদের ক্ষতি করে এমন Insect Order রয়েছে ৮টি (সারণি ২)। কেউ পাতা, ফুল বা ফল খেয়ে আবার কেউ কেউ গাছের শাখাপ্রশাখার ক্ষতি করে থাকে নানা ভাবে। কাজেই এ থেকে নিষ্কৃতির সহজতম উপায় হিসাবে ফসলের ক্ষেতে বা ফলের বাগানে আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করছি ক্লোরিন, তামা, মিথাইল প্যারাথিয়ন, লেড় আরসেনেট, সালফার, পারদ ঘটিত নানা কীটনাশক যেগুলোর মানুষের ক্ষতির পক্ষে সুদূরপ্রসারী ফল যেমন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, তেমনই গবাদি পশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন পশু, পাখি, ব্যাঙ, প্রজাপতির বিভিন্ন প্রজাতির একটা বিরাট অংশ প্রতিদিন বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা কিনা উদাসীনতার ভান করে বেগুন কিংবা ঢেঁড়শ গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কৃষি বিজ্ঞানীর পরামর্শ নিতে নিতে দোকানে ছুটি নতুন এবং আরও শক্তিশালী মারণ বিষের খোঁজে। আশ্চর্য আমাদের জ্ঞান

অহরণের চেষ্টা! প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে বই-এর পাতায় আর গবেষণাগারের অন্দরমহলে ব'সে নিরন্তর খুঁজে চলেছি পরিবেশ রক্ষার ঠিকাদারী ব্যবস্থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি, বাধ্যবাধকতার নিরিখে এবং তা সহজতর হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানীদের নির্লিপ্ততায় কিংবা এই অভিসন্ধির শরিক হয়ে পড়ায়।

এবার বোধহয় আমি নির্দিষ্ট কিছু মানুষদের বরং বলা ভালো আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার ধারক ও বাহক একশ্রেণীর মানুষদের ভাবাবেগে ঘা দিয়ে ফেললাম। কারণ আমি পরিবেশ বিজ্ঞান বলতে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন, কল্পনা আশ্রিত যুক্তিজালের সাপেক্ষে পুঁথি ঘাটা গ্রন্থকীটদের বমিতে মাখামাখি কতগুলি গবেষণা পত্রকে বুঝি না। বরং বুঝি এই নদী, আকাশ, মাটি, ঘাস, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ ইত্যাদির নিজস্ব তালমেলের যে মূল সুরটি ধ্বনিত হচ্ছে আদিকাল থেকে তার অনুরণনে সমৃদ্ধ হওয়া যে চেতনা তারই ব্যবহারিক রূপকে। তাই যে কৃষক আবহমান কাল ধরে বংশ পরম্পরাগত ভাবে পূর্বপুরুষের অর্জিত ব্যবহারিক জ্ঞান ভান্ডারের বাহক হয়ে কাদা-জল মেখে অবলীলায় বলে যেতে পারে ফসল ফলানোর মন্ত্রগুপ্তি, তাকেই আমি কৃষি বিজ্ঞানী বলি। এই ভাবনার তফাৎই মূলতঃ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন বা কর্মসূচীকে অথবা বলা ভাল নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যে গভীরতর প্রচেষ্টা তার পথকে দুটি ভিন্ন মেরুতে ঠেলে দিচ্ছে। যে কারণে আব্দুলঘাটার কৃষিক্ষেত্রে পোকার উপদ্রবের কারণ খুঁজতে আমি শস্যক্ষেতে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নি বরং পৌঁছে গেছি কৃষিক্ষেত্রের বেষ্টনির মধ্যে একান্ত আনমনে দাঁড়িয়ে থাকা এই উপেক্ষিত অরণ্যের মাঝে, আমার দীর্ঘদিনের পরম আশ্রয়স্থল এবং এতক্ষণে বোধহয় আমার ভাবনায় মিশিয়ে নিতে পেরেছি আপনাদের সন্দিগ্ধ ভাবনাগুলিকে।

আমি জানি আপনারা ভ্রু কুঁচকে এবার বলবেন— 'বুঝেছি বাপু, পোকা যেখান থেকেই আসুক বা যে কারণেই আসুক, এটা তো ঠিক যে তারা অযাচিত ভাবে ঢুকে পড়েছে আমাদের সাধের ফসলের ক্ষেতে। এখন আমরা কি তবে হাত গুটিয়ে ব'সে দেখবো আমার শস্য লুঠ হয়ে যাবে বর্গী পোকার আক্রমণে?' ঠিক বলেছেন। পৃথিবীর স্ব-ঘোষিত শ্রেষ্ঠ জীব আমরা হাত গুটিয়ে দেখবো— আমাদের পৌরুষ তা মেনে নিবে কীভাবে! কাজেই প্রশ্ন— 'কী হবে তবে আমাদের সদর্থক ভূমিকা?' এ প্রসঙ্গে আমি একবার চোখ রাখতে বলবো এই অরণ্যের পতঙ্গদের খাদ্য জালটিতে এবং মনযোগী হয়ে লক্ষ্য করুন খাদ্য-খাদকের প্রত্যেককে। অবাক হওয়ার রসদ যে সেখানেই লুকোনো রয়েছে— এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

এই যে এতক্ষণ আপনাদের প্রায় জোর করেই দাঁড় করিয়ে রাখলাম আব্দুলঘাটার অরণ্যে তা কি শুধুই সময় কাটানো? না, আমি যে ভয়ানক উদ্বেগকারী চিন্তা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম এই অরণ্যের মাঝে, বরাবর নানা অছিলায় আপনাদের ভাবাতে চাইছিলাম আমার পাশে ব'সে। এবার তার শেষ খোলাখুলি আলোচনায় আসি।

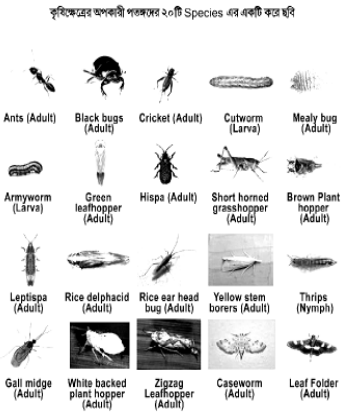

সবাই শত্রু নয়, কিছু কিছু পতঙ্গও রয়েছে আমাদের আশেপাশে যারা উদ্ভিদ বা মানুষ কারও সরাসরি ক্ষতি করে না। কাজেই তাদের বাদ দিয়ে তো এ আলোচনা ভিত্তিহীন। কারণ তারাই তো আমার পৃথিবী রক্ষার হাতিয়ার। তাদের খাদ্য তালিকা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য উদ্ভিদ ও মানুষের শত্রু পোকারা। সেই বন্ধু পতঙ্গদের ও তাদের খাদ্য শত্রু পতঙ্গদের সম্পর্কের একটি চেনা ছবি যা এই আব্দুলঘাটার অরণ্যে দীর্ঘ সময় ব'সে লক্ষ্য করেছি বারবার তা আপনাদের সামনে মেলে ধরছি।

Pied Paddy skimmer (Neurothemis tullia) হল জলা ঘাসজমি ও শস্যক্ষেত্রের এক ধরনের বড় ফড়িং (Dragonfly) যারা ফসলের কোন ক্ষতি করে না বরং মশা, মাছি, সবুজ গঙ্গাফড়িং (Green Grasshopper) ও বাদামী গঙ্গাফড়িং (Brown Grasshopper) দের খেয়ে থাকে যা অপকারী পতঙ্গদের থেকে হাত থেকে ফসল রক্ষায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তেমনই Coromendal Marsh Dart সহ বেশ কিছু প্রজাতির সরু ফড়িং (Damselfly) রা শস্য ক্ষেত্রের অনেক অপকারী পতঙ্গদের খেয়ে থাকে।

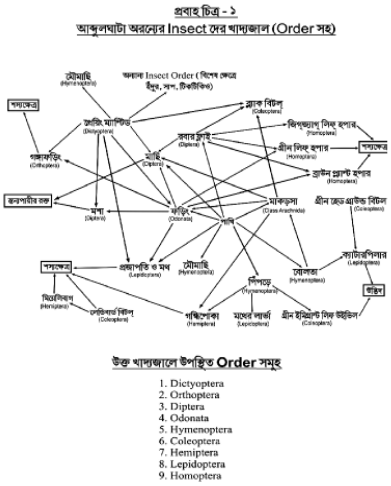

উক্ত খাদ্যজালে উপস্থিত Order সমূহ

1. Dictyoptera
2. Orthoptera
3. Diptera
4. Odonata
5. Hymenoptera
6. Coleoptera
7. Hemiptera
8. Lepidoptera
9. Homoptera

যেমন— Yellow stem borers মথ, Leaf folder মথ, Caseworm মথ, Black bug, Cricket ইত্যাদি এদের খাদ্য তালিকায় রয়েছে। কাজেই ফসলের ক্ষেতের আশেপাশে এদের বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতি আমাদের স্বস্তির কারণ হতে পারে।

Leaf Stiching Ant (Ocophyla smaragdyna)গ্রামবাংলার লাল পিঁপড়েদের আমরা অনেকেই চিনি একটি বিশেষ কারণে। এরা গাছের পাতা জুড়ে জুড়ে বড় বাসা তৈরী করে এবং এদের ডিম মাছ ধরার জন্য প্রায়ই ব্যবহার করতে দেখে থাকি। এরাও কিন্তু বেশ কিছু অপকারী পতঙ্গদের Predator। শস্যক্ষেতের বিভিন্ন ক্ষতিকারক পতঙ্গদের লার্ভা, এমনকি সবুজ-হলুদ ডোরাকাটা গন্ধীপোকাকে অনেকেই হয়তো এদের খাদ্য হতে দেখেছেন।

বিভিন ধরনের বোলতাদের প্রিয় খাদ্য তালিকাতে রয়েছে নানা প্রজাতির Catterpiller রা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়— হলুদ বোলতাদের খাদ্য তালিকায় যেমন রয়েছে Common castor প্রজাপতির লার্ভা শুয়োপোকা তেমন Paper Wasp দের প্রিয় খাদ্যের মধ্যে রয়েছে কপির পোকা বা সবুজ লেদাপোকারা। অনেক বোলতাদের খাদ্যের মধ্যে

রয়েছে উদ্ভিদের পক্ষে অপকারী বিভিন্ন aphids। Jwel wasp-দের শিকারের মধ্যে রয়েছে যেমন আরশোলারা। যদিও সেটা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সে আলোচনা না হয় অন্য কোনো একদিন করা যাবে।

এমন আরও একজনের কথা না বললে অন্যায়ই করা হবে। যার উপস্থিতি শস্যক্ষেতের শত্রু পোকাদের অনেককেই দমন করে থাকে অথচ তার খোঁজ রাখে কতজন? আমি Robberfly এর কথা বলছি। পৃথিবীতে fly প্রজাতির মধ্যে বৃহত্তর প্রজাতির দাবিদার এক আশ্চর্য পতঙ্গ যা Diptera Orderভুক্ত। এরা মানুষ বা উদ্ভিদের ক্ষতি করে না কিন্তু Green leaf hopper, Zigzag leaf hopper, Brown plant hopper, Black Bag- প্রভৃতির Predetor হিসাবে সত্যিই এদের জবাব নেই।

অনেকের কথাই তো বললাম তবু এমন একজন রয়েছে যার কথা বলতে হলে প্রথমেই মনে পড়ে একটি গানের কলি— 'তোমার তুলনা আমি খুঁজি না কখনও...' সত্যিই তুলনাহীন পতঙ্গ Preying Mantid। সমগ্র পৃথিবীতেই শস্যক্ষেতের ক্ষতিকারক Insect দের Predator হিসাবে যার দিকে নজর রয়েছে। তা শুধু আজ থেকে নয়। প্রাচীন চীনা অভিধানে যাদের উল্লেখ রয়েছে, যদিও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় কবিতার ছলে। পরবর্তীতে ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখায় এদের ডিমের মোড়ক, বেড়ে ওঠা এবং antennae-র কার্যকারিতা সম্বন্ধে লিখিত কথাগুলি পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ১৮ শতকে Mantid দের Biology এবং Marphology আরও বেশি নিখুঁত হয়েছে Roesel von rosenhof এর লেখা Insekten - Belustigungen (Insect Entertainments)-এ। এই Mantid রা হল এক বিস্ময়কর Insect যাদের খাদ্য তালিকায় বহুবিধ Insect Order থাকায় তারা Pest Control-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম। কাজেই ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষ mantid-দের Pest Control এর জন্য ব্যবহার করছেন। কোনো কোনো জায়গায় Mantid দের Oothica বিক্রি হয়। United State-এ ১৯৯০ শতকে (ইউরোপ এবং চীন থেকে) প্রথম এই প্রজাতিটি পরিচিত হয় Garden Predator হিসেবে Pest-এর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। South Carolina তে Carolina Mantis এবং Connecticut এ European mantis সরকারীভাবে জাতীয় পতঙ্গের গুরুত্ব পেলেও আমাদের দেশে এ ভাবনা দূর অস্ত। আব্দুলঘাটার অরণ্যের ঘাসবন এদের বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা গেলেও এদের বংশবিস্তারে প্রতিবন্ধকতা আগামী দিনে ভাবনার কারণ হয়ে উঠবে সে অনুমান আমার অনেক বছর আগেই ছিল।

কাজেই অনিলদার দেওয়া যে সাধারণ উত্তর আমাকে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সঙ্গে ঠেলে নিয়ে এসেছিল এই অরণ্যে; যার নাড়ি-নক্ষত্র ঘাটতে ঘাটতে শুধু মানুষের ভাল নয় বরং পরিবেশ রক্ষার মূল সূত্রটিকে খোঁজার মধ্যে দিয়ে মানুষ নামক পরিবেশের অন্যতম অঙ্গটিকে রক্ষার দায়ভার বহনের চেষ্টা করেছি মাত্র এতক্ষণ। আর সে ভাবনার শরিক হতে বারবার আপনাদের ডেকে নিয়েছি আমার ভাবনার পাশে, বলুন তো তাকে কি ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার সময় আজ? নাকি বিকল্প পরিবেশ বান্ধব ভাবনাই হতে পারে পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকার অন্যতম নিয়ন্ত্রিত পথ। এ প্রসঙ্গে যে কথাটি বলা খুব জরুরী তা হল জীববৈচিত্র্য সম্ভার (জেনেটিক রিসোর্স) কোন সময়ই পৃথিবীর সম্পত্তি (গ্লোবাল হেরিটেজ) হতে পারে না। এই সম্ভার সেই নির্দিষ্ট ভূখন্ডের সম্পদ, তা জাতীয় সম্পদ হিসাবেই রক্ষা করা উচিৎ। তাই কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাস্তুতন্ত্রকে তছনছ করে দেওয়ার যে আধুনিকতা তাতে রাশ পরানো এবং তার পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণই হতে পারে নিরাপদ জীবনযাপনের মূলমন্ত্র।

এই দীর্ঘ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে একটা বিষয় কি খুব স্বাভাবিকভাবে ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে যে— কৃষিক্ষেত্রের বেষ্টনির মধ্যে যে অরণ্য ও জলাভূমি তার স্বাভাবিক ছন্দপতনই সেখানকার বাস্তুতন্ত্রকে নাড়িয়ে দিয়েছে, বিঘ্নিত করেছে পাখিসহ কীটপতঙ্গদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে আর এই আলোড়ন ঘটানো অস্বাভাবিকতায় মানুষের পরিকল্পনাহীন বননির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করার আকাঙ্খা, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পরিবেশের সমস্ত উপাদানের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রবণতাকে দায়ী করতে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে? এই বনভূমির পতঙ্গদের যে বৃহৎ খাদ্যশৃঙ্খল তাকে ভেঙে দিতে বনসংলগ্ন মানুষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকাকে কী করে অস্বীকার করি বলুন তো? একটি ছোট নির্দিষ্ট এলাকার পরিবেশগত এই বিশ্লেষণ কি সমগ্র দেশ জুড়ে বৃহৎ পরিসরে তৈরী হওয়া অস্তিত্বের সঙ্কটের সমাধান সূত্রটিকে খুঁজে বের করার বা প্রায়োগিক দিকটিকে নিয়ে ভাবার রসদ হতে পারে না? এ ভাবনা আপনাদের সবার। উত্তর খোঁজার সঠিক পথটিও আপনাদের সম্মিলিত ভাবনায় একদিন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নিয়ে জেগে উঠবে এ আশা রাখাটা কি বোকামি হবে?

অন্যান্য বহু দিনের মত এবারও এই অরণ্যের মায়াজাল ছিঁড়ে এখন ফিরতে হবে প্রাত্যাহিক জীবনের বাঁচা-মরার মাঝখানে ত্রিঙ্কুশ অবস্থানে। আরও একবার উঠে দাঁড়িয়েছি যখন বেলা পড়ে এসেছে পশ্চিম দিগন্তে। কুলিকের জলে নেমে এসেছে অরণ্যের ছায়া দীর্ঘ হয়ে। সামনে ঝাঁপসা হয়ে আসা দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই আমার কাঁধে এসে উঠলো একটা বড় সবুজ প্রেয়িং ম্যান্টিড্। আমার মনে হচ্ছে তারও দৃষ্টি যেন আমার মতই শস্যক্ষেতের সীমানাকে মেপে নিতে চাইছে নিজস্ব ভঙ্গিতে।

করলা, হারিয়ে যেতে থাকা অনেক নদীর একটি

জাতীশ্বর ভারতী

২৮শে নভেম্বর, ২০১১ সকালে নিস্তরঙ্গ জলপাইগুড়ি শহরের বাতাসে হঠাৎ শোরগোল উঠল। অভূতপূর্ব ঘটনা। আধামজা করলা নদীতে শয়ে শয়ে মাছ মরে ভেসে উঠছে। দলে দলে লোক করলার পাড়ে ছুটছে। এমনিতে করলার পাড়ের বাতাস বিশেষ স্বাস্থ্যকর নয়। তবুও লোক যায় করলার হাওয়া খেতে। অনেকে ছুটল মরা মাছ ছেঁকে তোলার জন্য। কেউ বাজারে বেচবার জন্য, কেউ নিজেরা খাবার জন্য। সহজে আর সস্তায় পেলে বাঙালীর সব হজম হয়ে যায়। মর্নিং ওয়াকাররা গেল সন্ধ্যার আড্ডার রসদ খুঁজতে। আর সাংবাদিকরা নোট বই আর ক্যামেরা বাগিয়ে খবর করবার জন্য। জলপাইগুড়ি শহরে খবরের যে খুব অভাব। প্রত্যাশা মতোই পরের কয়েকদিন জলপাইগুড়ি খবর হল। কেন মাছগুলির গণমৃত্যু হল তার জন্য জানা তথ্যকে অজানা বানিয়ে অনেক ফুটেজ খরচ হল। কিন্তু তারপর ১১ই নভেম্বর ২০১২-তে তিস্তানদীতে, ১০ই মে ২০১৫ পাঙ্গা নদীতে, ডিসেম্বর ১৯ ২০১২ তিস্তা নদীতে একই ভাবে শয়ে শয়ে মাছ মরা ভেসে উঠতে থাকল। করলাতে মাছ মরার ঘটনার পর চারদিকে শোরগোল উঠল, প্রশাসন কিছু করে দেখাবার জন্য একজন চাষীকে গ্রেপ্তার করল। সে-ই নাকি চাষের জমিতে কীটনাশক ছড়াবার পরে তার ড্রাম করলার জলে ধুয়েছিল। সেজন্যই এই মাৎসন্যায়। সকলে ভালভাবেই জানি যে করলা নদীর ব্যাপক দূষণ এই মৎস্যমৃত্যুর জন্য দায়ী। আর স্বীকার করতে কষ্ট হলেও এই দূষণ দীর্ঘদিন ধরে আমাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফল।

পৌরসভা করলা নদীতে দুটো পে লোডার নামিয়ে দিল। করলা পরিষ্কার করার জন্য। দিন তিনেক তারা করলার বুক থেকে জমে থাকা আবর্জনা তুলে করলার ধারেই জমা করল। সে আবর্জনা দেখলে তাক লেগে যায়। টন টন পলিথিন, থার্মোকল, সিন্থেটিক কাপড়ের টুকরো। বেশিরভাগটাই শহরের দিন বাজারের বর্জ্যপদার্থ। দিন কয়েক জনতা অবাক হয়ে এই আবর্জনা দর্শন করল। তারপর তাদের নিজেদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পে লোডার দুটোও তাদের প্রকৃত কাজে ফিরে গেল। তোলা আবর্জনা আবার করলার গর্ভে ফিরে গেল। যারা এই কদিন করলাকে দূষণ মুক্ত করবার জন্য অনেক কথা বলে ফেলেছিলেন তারা আবার করলাতেই আবর্জনা ফেলতে শুরু করলেন। করলা আমাদের রাজ্যের অনেক নদীর একটা যে নদীগুলিকে আমরা অপব্যবহার করে নর্মদায় পরিণত করেছি।

করলা নদী জলপাইগুড়ি শহরের ফুসফুস। করলা নদীর উৎপত্তি জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরের বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। তিস্তার ডানপাশ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। অতীতে তিস্তার জল-এর কিছু অংশ এই নদীর পুষ্টি ঘটাত। কিন্তু এখন তিস্তার খাত কিছুটা বাঁ-দিকে সরে যাবার ফলে এই নদীর জলের যোগানে ঘাটতি পড়েছে। এছাড়া জঙ্গলে বর্ষার গড়িয়ে আসা জল, ভৌম জল যা উত্তরের পাহাড় থেকে চুপিসাড়ে ফল্গুধারার মত গড়িয়ে এসে হঠাৎ কোন জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে - এই নানা জলের যোগান করলাকে পুষ্ট করত। ব্যাপক হারে জঙ্গল নিধন, নদীর ধারণ অঞ্চলে জলের যোগান কমিয়ে দিয়েছে। ফলে গ্রীষ্মকালে এই নদী শুকনো থাকে। করলার উপর দিয়ে তিস্তার ডান হাতি খাল Aqua Duct প্রক্রিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে যা তিস্তাকে মহানন্দার সাথে যুক্ত করেছে। তিস্তা প্রকল্প দপ্তর কখনও কখনও এই খাল থেকে কিছু জল ছেড়ে করলাকে জীবিত রাখার চেষ্টা করে। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪ কিলোমিটার এর শেষ ছয় সাত কিলোমিটার জলপাইগুড়ি শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তিস্তা নদীতে গিয়ে মিশেছে। একসময়ে এই নদী সারা বছর জলে ভরে থাকতো। নৌকা চলত। শহরের সব জঞ্জাল এই নদী ধুয়ে নিয়ে চলে যেত। কিন্তু এখন নদীর জল নেই, স্রোত নেই অথচ শহরের জনসংখ্যা চতুর্গুণ হয়েছে। করলার ধার বেয়ে জলের সীমানা ছুঁয়ে তৈরি হয়েছে বহুতল। সেইসব বহুতল-এর পয়ঃপ্রণালীর মুখ করলায়। নদীর পাশে বাঁধের উপরে, ধারে বাস্তুহারা ভুবঘুরেরা ঝুপড়ি তৈরি করে থিতু হবার চেষ্টা করছে। তাদের শৌচকর্ম, বাসন মাজা, স্নান করা, জঞ্জাল ফেলা সবকিছু করলায়। নদীতে জল নেই, মজে উঠেছে নদী, মাছ বাজার সব্জী বাজারের জঞ্জালে। হাসপাতালের বর্জ্য পৌর বর্জ্য, মৃত প্রাণীর দেহ সবটাই যাচ্ছে এই নদীতে। এর পাশাপাশি নদীর গতিপথের আশেপাশে গড়ে উঠেছে যত্রতত্র ছোটছোট চাবাগান। এই চাবাগানগুলিতে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে Tetradifon, Endosulfan, Acetylcholinesterese জাতীয় মারাত্মক সব কীটনাশক। যেগুলি বৃষ্টির জল, পয়ঃপ্রণালীর জলের মাধ্যমে করলা নদীতে মিশছে। যার পরোক্ষ ফল হিসেবে আমরা এই সমস্ত কীটনাশককে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করবার চেষ্টা করছি। অবশ্যই অনেক অচিহ্নিত রোগবালাই সঙ্গী করে। আর প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে মাছের গণমরক ঘটছে। Endosuifan একটি নিষিদ্ধ কীটনাশক যা এখনও কৃষিক্ষেত্রে যথেচ্ছ ব্যবহার হয়ে চলেছে। চাবাগানে শুধু নয়। চাষের জমিতেও এর ব্যাপক ব্যবহার। করলার মজা নদীগর্ভে অনেক জায়গাতেই ধান আর নানা সব্জী চাষ হয়ে থাকে। সেখানেও কীটনাশক ব্যবহার হয়। ফলে করলার জলে সেই কীটনাশক জনিত দূষণ ছড়ায়। কীটনাশক ব্যবহারে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তাহলে নদীর জলদূষণ নিয়ে শুধু চোখের জল ফেলে লাভ নেই যারা জলদূষণ কী ও তার ফল কী জানেন তেমনই কারও কারও বাড়ীর পয়ঃপ্রণালী সরাসরি করলাতেই মিশেছে। অনেক ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক বানাবার খরচও বেচে গেছে। সচেতন মানুষের দ্বারা করলার দুষণ ক্রমশঃ বাড়ছে। নদীর পাড় দখল করে নদীর দূষণ বাড়িয়েছি, ধারণ এলাকায় বন ধ্বংস হয়েছে, কোনও কথা বলি নি। এখন

করলা আমাদের রোজকার আলোচনা আন্দোলনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ যে কে যেন বলেছিলেন, ঈশ্বর দয়াময় তাই দারিদ্র সৃষ্টি করেছেন। যাতে আমরা দরিদ্রের সেবা করতে পারি। যতই প্রচার চলুক এ স্বভাব বদলাবার জন্য সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। অপ্রিয় সত্য কথা বললে কর্তার বিরাগভাজন হতে হয়। তাতে পরে অসরকারী সংস্থা হলে অনুদানের আগমন বন্ধ বা কমে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। তাই করলা করলার মতো থাকে। আর তাকে দেখিয়ে কিছু লোকের বাড়ী গাড়ি হয়।

করলা নদীকে এই শহরের অনেকে জলপাইগুড়ির টেমস বলেন। তারা করলাকে আবার তার সেই প্রাচীন সুন্দর পরিপূর্ণ নদীর রূপে ফিরে দেখতে চান। তার জন্য অনেক বৈঠক, বিশেষ পরিকল্পনা, অর্থ বরাদ্দ সবই হয় ও হচ্ছে। অনেক খরচও হয়ে চলেছে। যেন ভিখারীর পায়ের ঘা যত্ন করে রেখে দেবার মতো ব্যাপার। নইলে রোজগার কমে যাবে যে। কিন্তু, আমি করলা নদীকে যতটা দেখছি ও পর্যবেক্ষণ করেছি তাতে এই নদীকে কোনো প্রকারেই তার অতীতের রূপ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। করলার জলের উৎস প্রধানত পাহাড় থেকে নুড়িকাঁকর সমৃদ্ধ ভাবর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নেমে আসা অন্তঃসলিলা জলধারা। বর্ষার সময়ে গড়িয়ে আসা জলের কারণে (Catchment water) স্বাভাবিক ভাবেই এই জলের পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়। শুকনো ঋতুতে কেবল ভৌম জলের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় জলের পরিমাণ বেশ কম থাকত। কিন্তু বলার মত জল থাকত। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে আর করলার উৎস বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে ব্যাপক বনধ্বংসের পরিণামে সেখানকার ভৌম জলের ভান্ডারে টান পড়েছে। তাই শুকনো ঋতুতে করলার ধারণ অঞ্চলে কোনও জল থাকছে না। পড়ে আছে শুকনো খাত। সেজন্য এখন শুকনো ঋতুতে নদীতে প্রায় জল থাকে না বললেই চলে। যে জল শুকনো ঋতুতে দেখা যায় তার সামান্য নদীর নিজস্ব ভৌমজল, বেশিরভাগটাই হলো শহরের পয়ঃপ্রণালীর জল আর করলা তিস্তার মাঝখানের বাঁধের তলা দিয়ে চুঁইয়ে আসা তিস্তার জল।

করলা নদী তিস্তা নদীতে মিশেছে। কিন্তু করলার নদীখাতের তুলনায় তিস্তা নদীগর্ভ বেশ কিছুটা উপরে অবস্থিত। সেজন্য করলা নদীতে স্রোত খুব কম। তাই নদীগর্ভে নানা জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। সেজন্য একে নদী না বলে মৃদু স্রোতের জলাভূমি বলা যায়। জলপাইগুড়ির পৌরপিতা এবং সেচদপ্তর সূত্রে জানা যায় যে বর্তমানে তিস্তার নদীতলের উচ্চতা জলপাইগুড়ির শহর থেকে প্রায় ৭ মিটার বেশি। ফলে করলার জল তিস্তা নদীতে প্রবেশ করতে বাধা পাচ্ছে। এজন্যই করলা বর্তমানে অতি ধীরগতি সম্পন্ন জলাভূমির রূপ নিয়েছে। এই নদীগর্ভে জন্মাচ্ছে নানা ধরণের জলজ উদ্ভিদ। আমার মতে যেহেতু করলার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নদী হিসেবে পুনরুজ্জীবন সম্ভব না তাই একে এই ভাবেই সংরক্ষিত করা উচিত। জলপাইগুড়ি শহরের জলাভূমির পরিমাণ খুবই কম। সেই দিক থেকে করলা এই শহরের ফুসফুস ও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ প্রাণীর আবাসস্থল। যেহেতু করলা নদীর উৎসে জলের যোগান নেই সেজন্য এই নদীকে জলপাইগুড়ির টেমস করবার প্রচেষ্টা বৃথা। তার চেয়ে এই নদী যতটুকু জল পাচ্ছে সেভাবে তাকে রেখে কেবল নদীটির দূষণমুক্তির প্রতি বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। জলপাইগুড়ি পৌর এলাকাতে জলাভূমির বড় অভাব। উল্লেখযোগ্য জলাভূমি কেবল রাজবাড়ি দীঘি। এজন্য আমরা মনে করি জলাভূমি হিসেবে করলা নদীর এই শহরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

জলাভূমি হিসাবে করলা কী কী ভাবে এই শহরের উপকার করতে পারে ও করে একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

১। শহরের বর্জ্য জলে যে ভারী ধাতব পদার্থ থাকে তা জলাভূমির নানা শৈবাল, উদ্ভিদ ও প্রাণী শোষণ করে জলকে শুদ্ধ করে। ফলে যেখানে বর্জ্য জল পরিশোধনের কোনও ব্যবস্থা নেই সেখানে করলার মতো স্থবির জলাশয় থাকা এক আশীর্বাদ।

২। করলা নদী অতি বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত জল ধারণ করে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থায় ও জমা জলের দ্বারা ঘটা বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩। ইঁট, কাঠ, কংক্রিটের শহরে যেখানে ভৌমজলের ভান্ডার পূরণ হওয়ার তুলনায় ব্যবহার বেশি সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডার গড়ে তুলতে এবং অক্ষুণ্ণ রাখতে করলা সাহায্য করে।

৪। জলাভূমি হিসেবে করলা নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর আদর্শ বাসস্থান, এই বাস্তুতন্ত্রে অনেক লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ।

৫। মৎস্য চাষ, পর্যটন শিল্প প্রভৃতি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে করলাকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা যায়।

৬। এই জলাভূমির শৈবাল ও নানা উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষে প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে।

শুকনো ঋতুতে বর্তমানে করলাতে যে জল থাকে তার কিছুটা আসে নদীখাতের মধ্য থেকে উঠে আসা ভৌমজল থেকে, কিছুটা নদীর পাশে অবস্থিত জনপদগুলির পয়ঃপ্রণালীর জল এছাড়া এর অতিক্ষুদ্র উপনদী রুকরুকা ও ধরধরার সামান্য জল। উৎসের কিছুটা পরে এই নদীকে তিস্তার ডানহাতি খালের তলা দিয়ে অ্যাকোয়াডাক্ট পদ্ধতিতে বইয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি দেখেছি সেখানে নদীর জলের পরিমাণ যৎসামান্য। এর কিছুটা পরে শিকারপুরের কাছেও করলার গভীরতা অত্যন্ত কম ও গতিবেগও মন্থর, এখানেও তলদেশে জলজ উদ্ভিদ দেখা যায়। করলা নদীর স্রোত বাড়াবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। করলার নাব্যতা বৃদ্ধি জলপাইগুড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এজন্য অনেক সংগঠন আবার যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করেছে। সরকারী পরিকল্পনাকাররা পরামর্শের জন্য তাদেরকেই পছন্দ করেন। করলা নদীর জলের গতিবেগ

বাড়লে শুকনো ঋতুতে করলার জল দ্রুত নেমে গিয়ে খাত শুকিয়ে যাবে। জলজ উদ্ভিদগুলি ও মাছসহ জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে। পাশাপাশি শুষ্ক নদীখাত ব্যবহৃত করে চাষআবাদ করবার প্রবণতা বেড়ে যাবে। ক্রমশঃ নদী ও জলাভূমিটি সংকুচিত হয়ে অবশেষে বিলুপ্ত হবে। জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে দেখলে করলার গুরুত্ব কম নয়। এই নদীতে কম বেশি ৩১ রকমের মাছ দেখা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ বাঁশপাতা, চেলা, ডানকোনি, খোকসা, ভোলা, মৌরলা, দারিকা, বাঘাপুঁটি, মোনাপুঁটি, সরপুঁটি, বাটা, মৃগেল, কালাবাটা, দারাঙ্গি, গুদুম এবং আঁশ ছাড়া গোষ্ঠীর বোয়াল, কুরকাটি, ট্যাংরা, চাগা, বানমাগুর, বটশিঙ্গি প্রভৃতি। এই মাছের বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হলে যেমন এখানকার বসবাসকারী মৎস্যজীবিদের অন্নসংস্থান হবে তেমনি বিনোদনের জন্য মৎস্য শিকারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

পর্যটন শিল্প, মৎস্যচাষে এই নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যে কোনও জলাভূমির মতোই করলাতেও শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। বর্ষাকালে নদীতে জলের পরিমাণ যথেষ্ট থাকে। তিস্তা করলার সংযোগস্থল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ। সুতরাং এই নদীতে দূষণ বন্ধ করতে পারলে এবং দেশীয় নৌকাতে জলবিহারের ব্যবস্থা করলে পর্যটনের দিক থেকে এর পরিচিতি ঘটান যেতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও এতে করে স্থানীয় বাসিন্দারা উপকৃত হতে পারে। আমাদের মতে দেশীয় নৌকাতে করে নৌকাবিহারের বন্দোবস্ত থাকলে কিছু মানুষের জীবিকার সংস্থানের সাথে পরিবেশের স্বাভাবিক শান্তি বজায় রেখে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটান সম্ভব।

হালে সরকারী উদ্যোগে করলার সৌন্দর্য্যায়ন হচ্ছে। করলার দুপাড় কংক্রীটে বাঁধিয়ে বাহারি বাতিস্তম্ভ, পাকা বাঁধান রাস্তা, আর বসবার আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু করলার দেহে যে রোগ তা যেমন ছিল তেমন আছে। রুগ্নশরীরে বাহারি পোষাক জড়িয়ে দিয়ে আমরা দায় সেরে আত্মতৃপ্ত। কংক্রীটে পাড় বাঁধিয়ে করলার বাস্তুতন্ত্রের খুব উন্নতি হল নাকি? বুঝতে পারছি না। করলার জল সেই পুতিগন্ধময় কালো জলই থাকল। নদীর দুপাশে অত আলো আমাদের রাতে বেড়াবার সুবিধে করল বটে, কিন্তু পরিযায়ী পাখিদের রাতের শান্তি কি থাকল?

করলা নদীর জন্য যদি কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তবে তা হোক এই নদী ও তার বর্তমান জীববৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে। আমার মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল করলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমাদের রাজ্যের আরও অনেক বিপন্ন নদীর ক্ষেত্রেও এই ধরণের ভাবনা প্রয়োজন। জনসাধারণের টাকা কেবল কাজ দেখানো অবাস্তব পরিকল্পনার মাধ্যমে অপব্যয় না করে প্রকৃত প্রকৃতিপ্রেমী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করলে করলা নদীকে জলপাইগুড়ির সম্পদ করে তোলা যাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১। Diversity of Cypriniformes Fish Fauna in Karala River, A Tributary of Teesta River at Jalpaiguri District of West Bengal : Amal kumar Patra and Tanmay Datta.

২। জলপাইগুড়ি পৌরসভা।

৩। বিভিন্ন সংবাদপত্র।

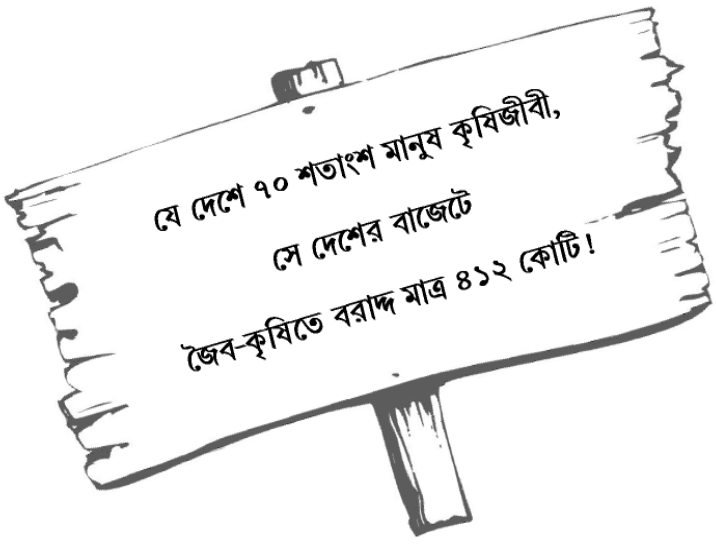

সংবাদ পরিবেশ

চিন্ময় দাস

ক্যান্সার প্রতিরোধে মণিপুরের কালোভাত ও পোটশানঘম দেবকান্ত

ক্যানসার প্রতিরোধী কালোচালসহ ১০০টিরও বেশি দেশজ চালের প্রজাতি ও অমূল্য ঔষধি গাছ চাষ করে নজির সৃষ্টি করেছেন মণিপুরের ষাটোর্দ্ধ কৃষি-মানুষ পোটশানঘম দেবকান্ত। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে যেখানে আবহাওয়াজনিত কারণে কৃষিকাজে অনীহার পরিবেশ তৈরী হচ্ছে সেখানে দেবকান্তজী বছরের পর বছর পরিবেশ বান্ধব পরম্পরাগত পদ্ধতিতে চাষাবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মণিপুর রাজ্য কালোচালের ধান উৎপাদনের জন্য এমনিতেই ভারত বিখ্যাত। এ রাজ্যের চাষিরা ২০টি প্রজাতির কালোচাল চাষ করেন। এদের মধ্যে ক্যানসার রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকরী হল 'চাখাও' প্রজাতি। কালোচালের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। দেবকান্তজী বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গে চাখাও সহ ২৫টি জাতের কালোচালের ধানচাষ করছেন। এবং ১০০টির মত ধানের প্রজাতিকে সংরক্ষণ করছেন।

২০১২ সালে দেবকান্তজী PPVFRA Conservation Award (Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act.) in 2012, পেয়েছেন ৫টি দুষ্প্রাপ্য ও উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কালোচাল চাষের জন্য যেগুলোর আবার বিভিন্ন ঔষধিগুণ বর্তমান। এরপরও তিনি থেমে নেই। গোটা মণিপুর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি প্রায় ২০০জন চাষি পরিবারকে চাখাও প্রজাতির কালোচাল চাষের কাজে নিয়োজিত করতে পেরেছেন। এবং অন্যরাও যেন এইসব দেশজ ধান জৈবপদ্ধতিতে চাষ করেন প্রতিনিয়ত তার চেষ্টা চালাচ্ছেন। পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডঃ অঞ্জলি পাঠক গবেষণায় দেখিয়েছেন কালোভাত, আয়ুর্বেদিক ঔষধ এবং জৈব খাদ্যশস্য খেলে ক্যানসার থেকে দূরে থাকা যায়। শুধু তাই নয়, কালোভাত সংক্রামক জ্বর, ডেঙ্গু, চিকেনগুনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ক্ষেত্রেও বেশ কার্যকরী।

কতটা নিরাপদ ভিটামিন-এ যুক্ত গোল্ডেন রাইস?

আজকাল ভোজ্যতেলে অনেক দেশে ভিটামিন-এ মেশানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম কোম্পানী সিনজেন্টা ধানের জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিটামিন-এ যুক্ত গোল্ডেন রাইসের উদ্ভাবন করেছে। মনে করা হয় এই যুগান্তকারী আবিস্কারের ফলে আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন-এ'র চাহিদা মেটানো যাবে। কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটা আজ প্রমাণিত আমাদের অনেক দেশজ প্রজাতির ধান রয়েছে যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন খনিজ মৌল ও ভিটামিনের পরিমাণ হাইব্রিড প্রজাতির ধানের থেকে অনেক বেশি। বহুজাতিক কোম্পানীর প্রচারকরা গোল্ডেন রাইসকে যুগান্তকারী হিসেবে ঘোষণা করলেও পরিবেশবিদ ও গবেষকরা এর বিরোধীতা করে বলেছেন এটি পরিবেশের পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক। তাদের বক্তব্য, গোল্ডেন রাইস তৈরী করা হয়েছে জি. এম. প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের নিজস্ব গঠন কাঠামোকে কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করা হয়, যা মানবদেহ ও মাটি উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক।

হু'র পরিসংখ্যান বলছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির ৫বছরের নিচের শিশুদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে একজন ভিটামিন-এ'র অভাবজনিত অসুখে ভুগছে। এবং ২০ শতাংশেরও বেশি প্রসূতি মায়েদের মধ্যে ভিটামিন-এ'র অভাব রয়েছে। জি. এম. পন্থী বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। আর সেই ভাতের মধ্যে দিয়েই পূরণ হবে ভিটামিন-এ'র ঘাটতি। গোল্ডেন রাইসই হবে শিশুদের ভিটামিন-এ'র চাহিদা পূরণের বড় উৎস।

কিন্তু জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদিত বিটি-বেগুন বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমারের চাষিদের কীভাবে নিঃস্ব করেছে তা আজ প্রায় সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি কেরল ও অন্ধ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেগুন আমদানী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে ওই বিটি'র কারণে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যখন জি. এম. খাদ্য নিষিদ্ধ করে দিচ্ছে, আশ্চর্যের সেখানে সিনজেন্টা, মনসান্টোর মত কোম্পানীরা সেটা নিয়েই বড়াই করে যাচ্ছে। অঞ্চলভিত্তিক মাটির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবার পাশাপাশি জি. এম. চাষে যেহেতু প্রচুর কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় তাতে জমির উর্বরতাও হ্রাস পায়। তাছাড়া এই ধরণের চাষে পরিবেশের উপকারী কীটপতঙ্গরাও ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। ফলে স্বাভাবিক চাষাবাদেই ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন টার্গেট গ্রুপ ছাড়া সুস্থ স্বাভাবিক (যার রক্তে স্বাভাবিক মাত্রায় ভিটামিন-এ আছে) যে কোন ব্যক্তি যদি এই ধরণের গোল্ডেন রাইস খান তবে 'হাইপারভিটামিনোসিস'-এ আক্রান্ত হতে পারেন। যারফলে ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধিও হতে পারে। ভিটামিন-বি ও ভিটামিন-সি প্রয়োজনের অতিরিক্ত শরীরে প্রবেশ করলে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু ভিটামিন-এ'র ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। তাছাড়া গোল্ডেন রাইসে যে পরিমাণ ভিটামিন-এ রয়েছে যে কোন কারো ঘাটতি মেটানোর জন্য যদি এই চাল খেতে হয় তবে দিনে প্রায় ৯ কেজি চালের ভাত খেতে হবে, যা বোধহয় কোন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আরো একটি বিষয় হল এই ভিটামিন-এ তেলে দ্রবণীয়। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ অর্থনৈতিক কারণে যেহেতু তারা ভোজ্য তেলের ব্যবহার প্রায় করে না বললেই চলে সেহেতু তাদের শরীরে ভিটামিন-এ গ্রহণই হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও যতই ভিটামিন-এ যুক্ত ভাত খাওয়া যাক না কেন সমস্যাটা বোধহয় মেটার নয়। সব মিলিয়ে এই গোল্ডেন রাইস স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা নিরাপদ সেটা পাঠক বন্ধুরাই ঠিক করে নিন।

বিশ্বের যেসব দেশে জি. এম. ফসল নিষিদ্ধ

এই মুহূর্তে যে সমস্ত দেশ জি. এম. বীজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে ইউরোপের দেশগুলি। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস, উত্তর আয়ারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, মাল্টা, সাইপ্রাস, গ্রিস, বুলগেরিয়া, রাশিয়া, সার্বিয়া, জর্জিয়া, ইটালি, ডেনমার্ক হাঙ্গেরী, মাল্ডোভা, লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, স্লোভানিয়া, আজারবাইজান, বসনিয়া, হরিজোগোভানিয়া, লুক্সেমবার্গ, ইউক্রেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড। এই ২৮টি দেশে ফসল ও সব্জির জি. এম. বীজ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যদিও এই দেশগুলির মধ্যে কিছু দেশে জি. এম. সংক্রমণ ঘটেছে (যেমন- ইউক্রেন)। অন্যান্যদের চিত্রও একটু দেখে নেওয়া যাক।

ফ্রান্স

জি. এম. বীজ ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ৭ বছর দেরী করায় ইউরোপীয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস ১০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করে ফ্রান্সকে। বিটি ভুট্টার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর প্রভাব দেখে তারা জি. এম. বীজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

জার্মানী "Friends of the Earth Germany" সংস্থা জার্মানীতে জি. এম. বীজ নিষিদ্ধ করার প্রচার শুরু করে এবং বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ অংশে বি. টি. ভুট্টাসহ অন্যান্য জি. এম. বীজ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ইতালি

রোম, মিলান, তুরিনসহ ২৫টি প্রোভিন্সে জি. এম. শস্য ও বীজ নিষিদ্ধ। এই দেশটি এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহণ করে।

অস্ট্রিয়া, লুক্সেমবার্গ, পর্তুগাল, গ্রীস, স্পেন প্রভৃতি দেশে বি. টি. ভুট্টার বীজ ব্যবহার এখন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ

অস্ট্রেলিয়া

তাসমানিয়া রাজ্য বর্তমানে আগাছা প্রতিরোধে আর জি. এম. প্রযুক্তি ব্যবহার করে না। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াও বাণিজ্যিকভাবে জি. এম. ফসল চাষ ও চারা রোপণ নিষিদ্ধ করেছে। সিডনি, পশ্চিম উইমেরাসহ অস্ট্রেলিয়ার রাজ্যগুলো বর্তমানে নিজেদের জি. এম. ফসল মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

নিউজিল্যান্ড

অক্ল্যান্ড এবং ওয়েলিংটন অনেক আগেই তাদেরকে জি. এম. মুক্ত বলে ঘোষণা করেছে। বর্তমানে ওই দেশে জিন পরিবর্তিত স্যামন মাছের উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

থাইল্যান্ড

ওই দেশে ৪০টি জি. এম. ফসলেই বাণিজ্যিক চাষ ও আমদানী গবেষণা ক্ষেত্র ছাড়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে।

ফিলিপিন্স

জি. এম. ফসল নিয়ে গবেষণা ছাড়া প্রতি পাঁচ বছরের জন্য ধাপে ধাপে তারা জি. এম. ফসলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

উপরোক্ত দেশগুলি ছাড়াও আমেরিকা, ব্রাজিল, পেরু, প্যারাগুয়েতে অনেক জি. এম. ফসলের চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া আফ্রিকার দুটি দেশ (আলজেরিয়া ২০০০ সালে থেকে, মাদাগাস্কার ২০০২ সাল থেকে) এশিয়ার চারটি দেশ (তুর্কি, কিরগিজিস্তান, ভুটান, সৌদি আরব) জি. এম. ফসলের উৎপাদন বন্ধ করেছে। ভুটান পৃথিবীর প্রথম দেশ যারা নিজেদের সম্পূর্ণ 'অর্গানিক স্টেট' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

প্রশ্ন হল ভারতের মত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ কোন পথে চলছে? মোদী সরকার কৃষিক্ষেত্রে জি. এম. সরিষার বীজ প্রয়োগ করায় দেশব্যাপী বিতর্ক, আন্দোলন শুরু হয়েছে। বন্দনা শিবার নেতৃত্বে ভারত সরকারকে এর বিরুদ্ধে একটি গণপিটিশন জমা দিলেও সরকার জি. এম. সরিষার বীজ কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে বদ্ধপরিকর। যার ভবিষ্যত-কল্পনা করা যেমন কষ্টকর তেমনি বেদনাদায়ক।

বিশ্বের প্রথম শহর সানফ্রান্সিসকো নিষিদ্ধ করলো প্লাস্টিক জলের বোতল

প্লাস্টিক বোতল কারখানাগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য নির্গমণের ফলে যে দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে সাড়া দিয়ে আমেরিকা তথা বিশ্বের প্রথম শহর সানফ্রান্সিসকো যেখানে প্লাস্টিক জলের বোতলের বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। বর্তমানে কয়েকটি জায়গা ছাড়া (যেখানে পাণীয় জলের উৎস নেই) সর্বত্রই বোতলবন্দী পাণীয় জলের ব্যবহার বন্ধ করেছে পৌরপ্রশাসন।

বর্তমানে প্লাস্টিক দ্রব্য ও প্লাস্টিকের বোতলবন্দী জলের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্লাস্টিকজাত দূষণ ও স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা। Bisphenol-A (BPA) বলে এক ধরণের যৌগ আছে যা প্লাস্টিক শিল্পের উর্বর ফসল বলে বিবেচিত। যে কারণে ওই যৌগ জলের পাইপ, বোতল, খাদ্যের মোড়ক ইত্যাদি থেকে সহজেই আমাদের শরীরে চলে যাচ্ছে। ওই যৌগ এতটাই ভয়ঙ্কর যে পরিস্কার জলের গ্লাসে পর্যন্ত লেগে থাকলে ধরা পড়ে না। যার ফলস্বরূপ আমাদের শরীরে বাসা বাঁধে Mammary এবং Prostate Cancer। পুরুষদের জিনগত পরিবর্তন এবং মহিলাদের কমবয়সেই শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন ঘটে। এইসব কারণেই জন্যই প্লাস্টিক বোতলের পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্যের ওপর প্লাস্টিকের মোড়কের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সানফ্রান্সিসকোর পৌরপ্রশাসন। এমনকি যারা নিয়ম ভাঙবে তাদের ১০০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানাও চালু হয়েছে।

পরিবেশ দপ্তরের চেয়ারম্যান Joshva Arce বলেন, এটা তাদের "Zero Waste Goal" লক্ষ্যে পৌঁছবার পদক্ষেপ। ২০১২'র মধ্যে তারা গোটা এলাকা প্লাস্টিক বর্জ্যমুক্ত করতে চায়। এ বিষয়ে তারা ৮০ শতাংশ সফল। গত ১০ বছর ধরে পৌরপ্রশাসন প্লাস্টিকজাত বোতল, ব্যাগ, খাদ্যের মোড়ক ব্যবহার বন্ধ নিয়ে অনেক আলোচনা ও কার্যক্রম নিয়েছেন যার ফলস্বরূপই তারা প্রায় শহরকে ৮০ শতাংশ প্লাস্টিকমুক্ত করতে পেরেছেন।

যদিও আমেরিকার দুই শক্তিধর বহুজাতিক কোকাকোলা এবং পেপসি কোম্পানীর কর্তারা বলেছেন দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনের এই পদক্ষেপ সর্বশেষ সমাধান নয়। বর্জ্য পুনঃব্যবহারের জন্য শহর পরিদর্শকের এটা একটা ভাঁওতা। তবে দেখা যাক এই ভাঁওতার শ্লোগানটি বহুজাতিক প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির ভাঁওতা নাকি দূষণমুক্ত শহর দেখতে চাওয়া পৌর প্রশাসনের ভাঁওতা, তা সময় বলবে।

সিকিমের জৈবচাষ শুধু গল্প নয়

সমস্ত দেশ জুড়ে যখন রাসায়নিক চাষের বিষের কারণে মানুষের শরীর হাজারও রকমের দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত তখন ভারতের সবচেয়ে ছোট রাজ্য হিসেবে সিকিমে জৈবচাষের আয়োজন যেন আমাদের কাছে বয়ে আনে এক বুক বিশুদ্ধ বাতাস, খুলে দেয় শেকল বন্ধ এক দরজা। ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন রাজ্যটি যখন রাসায়নিক ও কীটনাশকের বেড়াজাল থেকে মাটি, জল, গাছপালাকে মুক্ত করার কথা ঘোষণা করে তখন অনেকেই সংশয় প্রকাশ করে। কিন্তু ২০১৫ সালের মধ্যে যখন সিকিমবাসী ৭৫০০০ হেক্টর জমিকে সরকার কর্তৃক জৈবচাষে স্বীকৃতি প্রদান করাতে সমর্থ হয় তখন আমাদের ভুল ভাঙে। পাঁচ বছরে এতবড় সাফল্য ভারতের আর কোথাও আসেনি। এ বছর তারা গোটা সিকিমকে জৈবচাষের আওতায় এনে রাসায়নিক বিষ মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর।

গত পাঁচ-ছ'বছরে সিকিমে জৈবচাষে এত সাফল্য এসেছে সিকিমবাসীর নিরলস পরিশ্রম, একাগ্রতা এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার তাগিদ। ২০০৩ সালে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং রাজ্য বিধানসভায় সিকিমকে জৈবরাজ্যে রূপান্তরিত করার কথা ঘোষণা করেন। এবং বর্তমানে এই রাজ্যটি দেশের প্রথম জৈব রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে একেবারে প্রান্তিক স্তর থেকে। প্রকল্পটি চালু করার জন্য রাজ্যের প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবার ও বাগান মালিকরা বাধ্যতামূলকভাবে জৈবচাষ করছে। এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে সহযোগী হয়েছে 'Bio-Village' প্রকল্প। সিকিমে জৈবচাষ অন্তর্ভুক্তির প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'Bio-Village' প্রকল্প। ২০০৩-০৪ সাল থেকে এই

প্রকল্প শুরু হবার পর ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে চলে। রাজ্যের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়ন দপ্তরের (Food Security & Agricultural Development) মাধ্যমে ৩৯৬টি গ্রামকে 'Bio-Village' প্রকল্পে সংযুক্ত করা হয়। রাজ্যের চারটি জেলার ১৪০০০ কৃষক এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়। "Bio-Village" প্রকল্পের মাধ্যমে চাষি পরিবারগুলিকে গো-পালনে উৎসাহিত করা হয়। ফলে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা চতুর্দিক থেকে উপকৃত হয়। গোবর জৈবসার হিসেবে জমিতে দেওয়াতে জমি হিউমাস সমৃদ্ধ ও উর্বর হয়। রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য গোচোনা ও স্থানীয় কিছু গাছের পাতা পচিয়ে তরল সার তৈরী করে জমিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন বাড়িতে কম্পোজ সার তৈরীর প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এমনকি ধুপিগাছের পাতা পচিয়েও কম্পোজ তৈরী হয়। দক্ষিণ সিকিমের চিমোপানি গ্রামের কৃষিমানবী মায়া ছেত্রী তাঁর অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বলেন, ''সিকিমে এমনিতেই কৃষিতে খুব কম রাসায়নিক ব্যবহার করা হত। বর্তমানে গোবর সার ও কম্পোজ সারের মাধ্যমে আমরা সমগ্র চাষ প্রক্রিয়া চালাই, মাত্র ০.৫ হেক্টর জমিতে উদ্যানপালন দপ্তরের সহযোগীতায় ট্যাড়স ও সব্জি চাষ করে পরিবারের ছ'জন সদস্য আমরা স্বনির্ভর''। জৈবচাষে উৎপন্ন ফসল বিক্রির জন্য গ্রামে গ্রামে মহিলাদের উদ্যোগে জৈব বাজার গড়ে উঠেছে। সরকারের পক্ষ থেকে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন সব্জি, শাক, চাল, ডাল, মশলা বিক্রির বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল রাজধানী গ্যাংটকের এম. জি. মার্গের নিচে দেওয়ালি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশে গড়ে ওঠা Organic Market Complex যেখানে প্রতিটি জিনিসের দাম নির্দিষ্ট ও সুলভ।

বর্তমানে অনেক হোটেল ও রিসর্ট ও পর্যটকদের সম্পূর্ণ জৈব শাক, সব্জি ও খাদ্য পরিবেশন করা হয়। সরকারের উদ্যোগে "Organic Tourism" পর্যটন শিল্পে নতুন দিশা তৈরী করেছে। জৈব পদ্ধতিতে বেবি কর্ন ও আদা উৎপাদনে এই রাজ্য বর্তমানে প্রথম স্থানে। আর একটি উল্লেখ করার মত বিষয় সিকিমের টিমি চা-বাগানের কথা। এটা সিকিম রাজ্য সরকারের প্রথম ও বৃহত্তম জৈব চা-বাগান। যেখানে এক ফোঁটা রাসায়নিক বিষও স্প্রে করা হয় না। সিকিম সত্যি জৈবচাষে সারা দেশে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

পড়ুন ও পড়ান

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

যোগাযোগ — ssunnayan@gmail.com / www.ssu2011.com

পরিপ্রশ্ন

প্রযত্নে—বঙ্কিম দত্ত, ১৬ গঙ্গরাম পাল রোড, নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩১৬৫

জঙ্গলমহল

প্রযত্নে—রঞ্জন আচার্য, নর্থ লেক রোড, রবীন্দ্রপল্লী, পুরুলিয়া। কথা—৯৩৩২১৩৫৬১৬

অনীক

প্রযত্নে— পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯ কথা-০৩৩২২১৯৯২৫৬

এবং জলার্ক

প্রযত্নে—স্বপন দাসাধিকারী, ১১৫/২৯ পলাশ সরণি, ভদ্রকালী, হুগলি-৭১২২৩২, কথা-০৩৩২৬৬৩৩০৩০/৯৪৩২২০১২৮৮

আসানসোল শিল্পাঞ্চলের

উদ্যোগ

প্রযত্নে : ড. স্বাতী ঘোষ, বিদ্যাসাগর সরণি, আসানসোল-৪

দূরাভাষ ৯৪৩৪০২২৫২২

রাস্তার আলোক দূষণ ও বাস্তুতন্ত্র

বিশ্বজিৎ বসাক

শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ও জলদূষণের পাশাপাশি আলোকদূষণও এই গতিময় জীবনে অজান্তেই বেড়ে চলেচে। এই দূষণ প্রকারান্তে ব্যাপক আকার ধারণ করে উৎসবের মাসগুলোতে যখন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আলোকস্তম্ভের আলোক রোশনাইয়ে ঝলমলিয়ে ওঠে মহানগর থেকে শুরু করে ছোটোখাটো শহরগুলো। এই আলোর টানেই ছুটে আসে হাজার রকমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পতঙ্গ থেকে শুরু করে বৃহৎ আকারের পতঙ্গরা। এদের কেউ কেউ উপকারী আবার কেউ অপকারী। যখন এরা এই আলোর টানে রাত্রিবেলায় শহরের পার্শ্ববর্তী ও শহরাঞ্চলেরর ভিতরের গাছপালা, ফসলের ক্ষেত, বনভূমি ও জলাশয় থেকে আসে তার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এই পতঙ্গেরা আমাদের অনেকেরই কাছে ঘিনঘিনের অথবা ভীতি সঞ্চারক। কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের নিরিখে এরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরা বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-শৃঙ্খলে প্রথম শ্রেণীর খাদক। তাই এদের একসাথে বিপুল সংখ্যায় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের নিধন একটা বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খল এক নিমেষে ধ্বংস করে দিতে পারে।

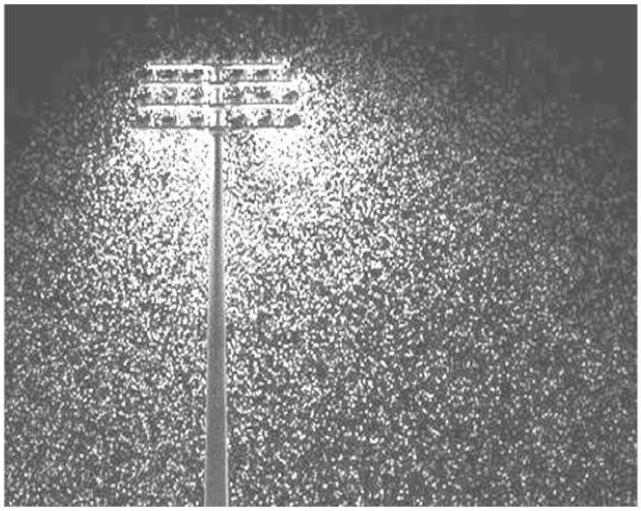

এদের সংখ্যার বিলুপ্তির প্রধান কারণ হিসেবে আমরা হয়তো ভাবি কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার। এটা ঠিকই যে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কিছু কীটের বিরুদ্ধে দমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু আলোর যথেচ্ছ ব্যবহার এর কয়েকগুণ বেশি। রাস্তার আলোকস্তম্ভের অথবা পূজোর মরশুমে ব্যবহৃত আলোর বেশিরভাগ আলোই এতটা জোরালো যে তার প্রায় কয়েক মাইল দূরের কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করতে পারে। এই পতঙ্গরা আলোর একটা বিশেষ তীব্রতায় (light intensity) এবং পরিমাণে (lux) আকৃষ্ট হয়। উৎসবের মরশুমে এরা বেশিরভাগই গিয়ে পড়ে শহরের ব্যস্ত রাস্তায়, চলন্ত গাড়ির চাকায় অথবা পথচারীর পদপৃষ্ট হয়ে মারা যায়। এটা একপ্রকার হত্যা বলা যায়। সুতরাং ফসলের এই বন্ধুপোকারা যদি এভারে মারা যায়, তাহলে শত্রুপোকার সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। যদিও জীববিজ্ঞানের নিরিখে কোনো পোকামাকড়ই শত্রু বা বন্ধু নয়। বাস্তুতন্ত্রে এদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ভূমিকা আছে। যেমন ধরা যাক, লেডি বার্ড বিট্‌ল যা কুমড়ো গাছের একটি ক্ষতিকারক পোকা। অথচ এই পোকাই তুঁত, জবা, পেয়ারা, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের দয়ে পোকাকে (Mealy Bug) জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যা একপ্রকার পরভূক-পরজীবিতার উদাহরণ। যদিও কৃষিক্ষেত্রে আলোক ফাঁদের প্রচলন কীটপতঙ্গ দমনের জন্য বহুকাল থেকেই প্রচলিত। যেমন ধরা যাক, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 'ভোলা পোড়া' বা 'হুকোহুকি' উৎসব যা কার্তিকমাসে সন্ধ্যা অথবা ভোরের দিকে মাঠে খড়গাদার স্তুপ পুড়িয়ে পোকামাকড় তাড়ানোর প্রচলন রয়েছে। আবার আধুনিক কৃষিক্ষেত্রে আলোক ফাঁদ (light trap) এর ব্যবহার বিশেষ বিশেষ আলোর সাহায্যে বিশেষ কিছু পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু তা কখনোই যথেচ্ছাচার নয়।

ইতিমধ্যেই আলোক দূষণের প্রভাবে ফড়িং-এর সংখ্যা ফি-বছর কমছে এবং তার ফলে মশার এই বাড়বাড়ন্ত। ডি.ডি.টি-এর প্রয়োগও পরিবেশ ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। সুতরাং মশাকে জৈবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে প্রয়োজন ফড়িংদের যারা ভোরের দিকে মশা শিকার করে। আলোকদূষণ জৈব-কৃষিতেও যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই কীটপতঙ্গরা যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে আমরা প্রকৃতি থেকে এদের সংগ্রহ করব কীভাবে?

ভারতে জিন পরিবর্তিত সরিষা (G.M. Mustard) চাষ প্রতিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলুন

যোগাযোগ - শুভম ভট্টাচার্য, গীতাঞ্জলী মার্কেট, নারায়ণপুর, বাজারপাড়া, পোঃ - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১০১
কথা -৯৪৩৪৪২৫৩২১, ৯৪৩৪৩৫৪৬০৪, ৯৪৩৪৯৬২৮৪০